বঙ্গভাষার ইতিহাস।

প্রথমভাগ।

প্রণেতা

শ্রী মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

গুপ্তপ্রেস যন্ত্র

কলিকাতা—২৪ মির্জ্জাফর্শ লেন।

সম্বৎ ১৯২৮, জ্যৈষ্ঠ।

(পূর্ব্বপীঠিকা।)

প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, "বঙ্গ ভাষার ইতিহাস" নামক একটী প্রবন্ধ জ্ঞানদীপিকা সভার দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশন সময়ে মৎকর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। নানা কারণ বশতঃ এত দিন ইহা মুদ্রাঙ্কন করিতে সক্ষম হই নাই। এক্ষণে কতিপয় বন্ধুর উৎসাহে তাহার অনেক স্থান পরিবর্ত্তন ও সংযোজন পূর্ব্বক, সাধারণ সমক্ষে প্রচার করিলাম। মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুঃসাহসের কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। কারণ ইতিহাস রচনা করা কতদূর ক্ষমতার আবশ্যক, তাহা বোদ্ধা মাত্রেই অবগত আছেন। সেই ক্ষমতার শতাংশের একাংশও এ গ্রন্থরচয়িতার আছে কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশের ইতিবৃত্ত অত্যন্ত অস্পষ্ট। যেদেশের ইতিবৃত্ত অত্যন্ত অপরিজ্ঞেয়, সেই দেশপ্রচলিত ভাষার আদিম বিবরণ তদপেক্ষা অধিক দুষ্প্রাপ্য, তদ্বিষয়ে বাক্য ব্যয় অনাবশ্যক। বহু অনুসন্ধান দ্বারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বঙ্গভাষার ইতিহাসঘটিত কয়েকটী কথা লিখিত হইল। যশোলাভ বা অর্থোপার্জ্জনার্থ ইহা রচিত হয় নাই, ইহার দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যসমাজের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হইলেই আমার উদ্দেশ্য সাধিত

হইবে। সাধ্যপক্ষে ইহা সাধারণের পাঠোপযোগী করিতে ত্রুটি করি নাই, তথাচ ইহাতে যেসকল ভ্রম রহিল, তাহা সজ্জনমণ্ডলীর উদার স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। অবশেষে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, প্রণয়াস্পদ বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় আমাকে বিশেষ প্রোৎসাহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইনি আগ্রহ প্রকাশ না করিলে, আমি এই পুস্তক প্রচার করিতাম কি না সন্দেহ।

কলিকাতা, কুমারটুলি
১৯ নং জয়মিত্রঘাট লেন
সম্বৎ ১৯২৮, জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এই পুস্তক রচনা সময়ে নিম্ন লিখিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক ও পত্রের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি :—

Calcutta Review, Westminster Review. কবিচরিত এবং বিবিধার্থ সংগ্রহ।

বঙ্গ ভাষার ইতিহাস।

(বঙ্গ ভাষার উৎপত্তি।)

পার্থিব সকল পদার্থই পরিবর্ত্তনশীল। আমরা যে দিকে জ্ঞাননেত্রোন্মীলন করিয়া দেখি, সেই দিকেই দেখিতে পাই যে, কোন বস্তু নূতন উৎপন্ন হইতেছে, কোন বস্তু বা ধ্বংস হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুতে লীন হইতেছে। অদ্য যে বস্তু একরূপ দেখা যায়, কল্য তাহার ভিন্ন ভাব দৃষ্ট হয়; বর্ত্তমান নিমেষ মধ্যে আমরা যাহা দেখি, আবার তৎপরক্ষণেই তাহার আর একটী ভিন্ন ভাব লক্ষিত হয়; অদ্য ঘোর ঘনাবৃত হইয়া গগনমণ্ডল হইতে অনবরত বারিধারা বর্ষিত হইতেছে, কল্য ঠিক বিপরীত ভাব; অদ্য খণ্ডপ্রলয়ের উৎপাতে অধিষ্ঠানভূত ধরণীমণ্ডল কম্পমান হইতেছে, জীবগণ ওষ্ঠাগত-

প্রাণ হইয়া নিজ নিজ রক্ষা হেতু উপায় চিন্তা করিতেছে, কল্য আবার সমুদায়ই স্থিরভাব, প্রাণিগণ নির্ভয়-চিত্তে মহোল্লাসে বিচরণ করিতেছে। এ সমস্ত বস্তুর কথা দূরে থাকুক, অতি দৃঢ়তর পর্ব্বত সমূহ যাহা কখন ভিন্ন ভাব ধারণ করিবে এরূপ ভাব আমাদিগের অন্তরাকাশে উদিত হয় নাই, তাহাও কালক্রমে অনন্তনিয়মাধীন হইয়া ভগ্নচূড় হইতেছে। এমন কি, কোনটীর বা একেবারে চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ হ্রদরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; সুবিস্তৃত দ্বীপ সমূহ যাহা অসংখ্য অসংখ্য জীবের অধিষ্ঠান ভূমি-সমূহ হইতে শত শত হস্ত উচ্চ, সেই দ্বীপপুঞ্জও সাগরে নিমগ্ন হইয়া, জলাকীর্ণ স্থানে পরিণত হইতেছে; কোথাও বা সাগর-গর্ভ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত বাহির হইয়া একটী জনাকীর্ণ দ্বীপ সমুৎপন্ন হইতেছে। পৃথিবীমণ্ডলে এমন কোন বস্তুই দৃষ্ট হয় না, যাহা পরিবর্ত্তনের অধীন নহে। সুতরাং মনুষ্যের আন্তরিক ভাবও যে এই নিয়মের অনুবর্ত্তী,

তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে হেতু আমরা সাধারণত দেখিতে পাই যে, শৈশবাবস্থায় মনুষ্যের একরূপ আন্তরিক ভাব থাকে, যৌবন কাল উপস্থিত হইলে তাহা পরিবর্ত্তিত হয়, আবার যৌবন কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, প্রৌঢ়ে পদার্পণ সময়ে মনোবৃত্তি সকল অন্যভাব ধারণ করে, এবং বৃদ্ধাবস্থায়ও সেইরূপ পরিবর্ত্তনের নিয়ম আছে। মনুষ্যের মনোবৃত্তি সকল পরিবর্ত্তনের সহিত অবস্থা, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। প্রাচীন কালের ইতিবৃত্তগ্রন্থ সকল পর্য্যালোচনা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, যখন একটী জাতির রীতি নীত্যাদি সংস্কৃত হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত হইতে থাকে, ইহার উদাহরণ স্বরূপ ইংরাজজাতি ও তাঁহাদিগের ভাষার প্রতি মনোনিবেশ করিলে অনায়াসেই উপলব্ধি হইতে পারিবে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদিগের ভাষা অন্য কোন

একটী প্রাচীন ভাষার অপভ্রংশেই উৎপন্ন হইয়াছে। অস্মদ্দেশীয় ইতিবৃত্তগ্রন্থ অতি দুষ্প্রাপ্য। কেবল মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত ভিন্ন আর যাহা কিছু ছিল, অধিকাংশই উপর্য্যুপরি রাষ্ট্রবিপ্লবে বিধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আর যে সমস্ত ইতিহাস সম্বন্ধীয় পুস্তক দৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ অথবা আশ্চর্য্য উপাখ্যান সমূহে পরিপূরিত, বিশ্বাসযোগ্য সার বিষয় অতি অল্পাই আছে। কিন্তু যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাস্য প্রাচীন গ্রন্থদ্বয়ে ভাষা সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই দৃষ্ট হয় না। এই নিমিত্ত কোন্ সময়ে এই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার সুনিশ্চয়রূপে স্থির করা যায় না। কিন্তু আমরা বিবেচনা দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি যে, এই ভাষা-রত্ন, সংস্কৃত-ভাষা-রত্নাকর হইতেই উত্তোলিত হইয়াছে। বোধ হয়, সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিবেন না। অতএব এই খনি অন্বেষণ করিলে অবশ্যই ইতিলব্ধ রত্ন সমূহের উৎপত্তি বিবরণ

কিছু না কিছু অবগতি হইতে পারিবেই পারিবে। অতএব তদন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

ইউরোপীয় ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা লিখিয়াছেন যে, অতি পূর্ব্বকালে পুরাতন গোলকার্দ্ধে কেবল তিনটী প্রাচীন ভাষা মাত্র প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে এসিয়া খণ্ডের অন্তঃপাতি ইরান্ প্রদেশীয় একটী ভাষা হইতে লাটিন, জর্ম্মন্, গ্রীক, নর্স, প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হয়; এসিয়া খণ্ডের জেন্দ ভাষা হইতে উর্দ্দূ ইত্যাদি এবং সংস্কৃতের অপভ্রংশে ভারতবর্ষীয় বর্ত্তমান প্রচলিত ভাষার প্রায় অধিকাংশই উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রকটিত হইল। যথা,—বর্ত্তমান যে কোন ভাষা যতই সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হউক না কেন, প্রথমতঃ একেবারে কখনই সেরূপ হইতে পারে না, অপরিণতাবস্থা হইতেই ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া একটী উৎকৃষ্ট ভাষা মধ্যে পরিগণিত হয়। সংস্কৃত যে এত উৎকৃষ্ট ও সুললিত ভাষা, তাহাও বহুবার পরিবর্ত্তিত না হইয়া কখন এরূপ পূর্ণাবস্থা ধারণে সমর্থ হয় নাই। কারণ

সংস্কৃতভাষাবিৎ পণ্ডিত মহাশয়েরা বিশেষ সমালোচনা দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, ঋগ্বেদ সংহিতার ভাষাই অতীব প্রাচীন। কিন্তু তাহার সহিত মনুসংহিতা ও বাল্মীকি রামায়ণের ভাষার তুলনা করিয়া দেখিলে অনেক পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। পরন্তু আবার ঐ সংহিতার ও রামায়ণের ভাষার সহিত মহাভারতের অনেক বৈলক্ষণ্য প্রতীতি হইয়া থাকে। / মহাভারত রচনার কয়েক শত বৎসর পরে, ভারতকবিকুলশেখর কালিদাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দ্বারা ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বোধ হয় কালিদাসের সংস্কৃত, তান্ত্রিক সংস্কৃতে পরিণত হইয়া থাকিবে। এস্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কিন্তু স্থির চিত্তে বিভাবনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই জ্ঞাত হইতে পারা যায় যে, উচ্চারণসৌকর্য্য ও অধিক ভাব অল্প সময় মধ্যে প্রকাশার্থই ভাষা এইরূপ সংস্কৃত হইয়া থাকে।) বৈদিক-সংস্কৃত অতীব দুরূহ ও দুরু-

চ্চার্য্য,সংস্কৃত ভাষা-বিশারদ পণ্ডিত মহাশয়েরাও সময়ে সময়ে উক্ত গ্রন্থরচিত শব্দাবলী উচ্চারণ করিতে সঙ্কুচিত হন। বোধ হয়, তজ্জন্যই মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত ও কালিদাসের সংস্কৃত অপেক্ষাকৃত সরল ও ঐ সকল রচনায় অধিক বিকর্ষণ কার্য্য ব্যবহৃত হইয়াছে। (খৃষ্টীয় শতাব্দীর ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের সমকালে সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশে "গাথা" নাম্নী একটী পৃথক ভাষা সমুৎপন্ন হইয়াছিল। সংস্কৃতজ্ঞ মহোদয়গণ বলেন যে, গাথা প্রাচীন সংস্কৃতের সহিত প্রায় সর্ব্বাংশেই সমান, কেবল বিকর্ষণ কার্য্যের নিমিত্ত বিভক্ত্যাদির কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এই অপভ্রংশিত ভাষা সমুৎপন্নের প্রায় ২৫০ বৎসর পরে অশোক রাজার আধিপত্য সময়ে উহাই পরিবর্ত্তিত হইয়া "পালী" আখ্যায়িকা ধারণ করে। এই ভাষা এ পর্য্যন্ত সিংহল দ্বীপে প্রচলিত আছে।) অশোক রাজার প্রায় এক শত বৎসর পরে প্রাকৃত ভাষা সমুৎপন্ন হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে যে প্রাকৃত

ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, অনাবশ্যক বোধে এস্থলে লিখিত হইল না। প্রবল প্রতাপান্বিত উজ্জয়িনী স্বামী বিক্রমাদিত্যের শাসন কালে সংস্কৃতভাষা অপ-ভ্রংশিত হইয়া প্রাকৃত, মহারাষ্ট্রীয়, মাগধী, শৌরসেনী, পৈশাচী, ও পাশ্চাত্য প্রভৃতি অন্যূন দশ বা দ্বাদশটী ভাষার সৃষ্টি হয়। প্রাচীন আর্য্যগণ সেই সমূহকেই প্রাকৃত নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এবং বোধ হয় সেই সমুদায় ভাষার পরিবর্ত্তনেই বাঙ্গালা, তৈলঙ্গী, গুজরাটী, হিন্দী প্রভৃতি ভারতবর্ষের অধুনা প্রচলিত ভাষা সমূ-হের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কিন্তু কোন্ প্রাকৃত হইতে কোন্টার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিশেষত, বঙ্গ ভাষায় লিখিত কোন প্রাচীন রচনা না থাকায় এই ভাষার আদিম বিবরণ সংগ্রহ করা অতীব কঠিন। বহু অনুসন্ধান দ্বারা অবগতি হয় চৈতন্য দেবের আবির্ভূত হইবার এক শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা শিবসিংহ

লক্ষ্মী-নারায়ণের আধিপত্য সময়ে, বঙ্গদেশে বিদ্যাপতি নামক এক ব্যক্তি বঙ্গভাষায় অনেক-গুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েকটী এখনও বঙ্গদেশে বর্ত্তমান আছে। সেই সকল পদাবলীর রচনা প্রণালী দৃষ্টে অতি প্রাক্তন বলিয়া অনুমান হয়, এবং তাহাতে হিন্দী শব্দের আধিক্য প্রযুক্ত বোধ হয় যে, পূর্ব্বে অস্মদ্দেশে হিন্দীভাষা প্রচলিত ছিল। এবং এই হিন্দী-ভাষা যে মগধের অপভ্রংশে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রমাণ চীনদেশীয় ভ্রমণকারী ফাহিয়া-নের গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন ষোড়শ শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে কেবল সংস্কৃত ও মাগধীভাষা প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হই-য়াছে মাগধী সংস্কৃতের অপভ্রংশিত ভাষা। হিন্দী ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও প্রতিপন্ন করাগেল। এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদিগের রচনা পাঠে অব-গত হওয়া যায় যে হিন্দীরই অপভ্রংশে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

(প্রাচীন রচনা ও গ্রন্থকর্ত্তাগণ।)

উৎপত্তি বিবরণ এক প্রকার কথিত হইল, এক্ষণে প্রাচীন রচনা ও গ্রন্থকারদিগের বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বিদ্যাপতি, রাজা শিবসিংহ নারায়ণের সমকালে আবির্ভূত হন রাজা শিবসিংহ নারায়ণ চৈতন্য দেবের প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি পঞ্চ-গৌড় নামক স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই স্থানটী কোথায়, তাহা জ্ঞাত হইবার উপায় নাই, কিন্তু ইহা যে বঙ্গদেশের অন্তর্গত তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। চৈতন্যদেব খৃষ্টীয় ১৪৮৪ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং বিদ্যাপতি এক্ষণ (১৮৭০ খৃঃ অঃ) প্রায় ৪৮৬ বৎসর হইল বঙ্গদেশে (১৩৮৪ খৃঃ অঃ) বিদ্যমান ছিলেন। ইহাঁর রচনাবলি পাঠ করিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় যে ইনি একজন বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী। বিদ্যাপতির রচনায় রূপনারায়ণ

প্রভৃতি আরও কয়েকটী ব্যক্তির নামে ভণিতা দৃষ্ট হয়। বোধ হয় তাঁহারা বঙ্গীয় আদি কবির প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন*। বিদ্যাপতির পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা রচয়িতা এপর্য্যন্ত আমাদিগের নয়ন-পথের পথিক হয় নাই, সুতরাং বিদ্যাপতিকেই প্রথম বাঙ্গালি রচয়িতা বলিয়া আখ্যাত করা গেল। সাধারণের গোচরার্থ বিদ্যাপতি-লিখিত কয়েকটী পদ এস্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ—

"এ ধনি কর অবধান। তো বিনে উনমত কান॥
কারণ বিণু ক্ষণে হাস। কি কহয়ে গদ গদ ভাষ॥
আকুল অতি উতরোল। হা ধিক্ হা ধিক্ বোল॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ। ধরই না পারই কেহ।
বিদ্যাপতি কহ ভাখি। রূপনারায়ণ সাখি॥")

(প্রহেলিকা।)

"বিধু কোলে করি, বামন ফিরয়ে,
দেখয়ে জনম আঁধে।
বোবায় বলিছে, বধিরে শুনিছে,
বন্ধ্যার তনয় কান্দে॥

---

* কারণ বিদ্যাপতি একস্থলে লিখিয়াছেন।
"বিদ্যাপতি কহ ভাখি।
রূপ নারায়ণ সাখি॥"

পাদ্য অর্ঘ্য নিয়া, পথে দাঁড়াইয়া,
আছয়ে পিতার পিতা।
ভয়ে ভঙ্গ দিয়া, গেল পলাইয়া,
শুনিঞা ভবিষ্য কথা॥
কহ বিদ্যাপতি, পিতা না জনমিতে,
পুত্রের প্রতাপ এত।
না জানি ইহার, পিতা জনমিলে,
প্রতাপ বাড়িত কত॥

(বিদ্যাপতির সময়েই চণ্ডিদাসের কবিত্বশক্তি জ্যোতি বঙ্গভূমে প্রতিভাতিত হইয়াছিল। নান্নুর গ্রামে তিনি বাস করিতেন, এই গ্রাম জেলা বীরভূমি সংক্রান্ত সব ডিবিজন সাকুল্লীপুরের পূর্ব্বদিকে অব্যবহিত নৈকট্যে অবস্থিত। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন *। "বড়ু" তাঁহার উপাধি ছিল †। নান্নুরগ্রামে "বাশুলি"

* নরহরি দাসের ভাণতায় এইরূপ দৃষ্ট হয়:—
"জয় জয় চণ্ডিদাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যাঁর যশ রসায়ণ গাওত জগত জনে॥
বিপ্রকুলে ভূপ ভুবনে পূজিত অতুল আনন্দ দাতা।
যাঁর তনু মন রঞ্জন নাজানি কি দিয়া করিল ধাতা॥"

† চণ্ডিদাস নিজ কবিতায় এইরূপ লিখিয়াছেন:—
"ধৈরজ নাহিক তায়। বড়ু চণ্ডিদাস গায়॥"

অর্থাৎ বিশালাক্ষী নামে এক প্রস্তরময়ী দেবীমূর্ত্তি অদ্যাবধি বর্ত্তমানা আছেন*। সেই দেবী চণ্ডিদাসের প্রথম ইষ্ট দেবতা ছিলেন। পরে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে নান্নুর গ্রাম নিবাসিনী রামী নাম্নী এক রজককন্যা তাঁহার উপনায়িকা হয়। কথিত আছে, বিশালাক্ষী স্বয়ং তাঁহাকে কৃষ্ণোপাসনা করিতে উপদেশ প্রদান করেন, এবং তজ্জন্যই চণ্ডিদাস কৃষ্ণোপাসনা কালে যে সকল সংকীর্ত্তন ব্যবহার করিতেন, তন্মধ্যে বিশালাক্ষীকে উপদেশকর্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন†। তিনি কৃষ্ণলীলা বিবরিণী অনেক পদাবলী ও "শ্রীরাধা গোবিন্দ কেলীবিলাস" নামধেয় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন

* এই দেবতার প্রতিমূর্ত্তি শিরোপরি চতুর্ভুজাকৃতি এক খণ্ড খোদিত প্রস্তর।

† "কহে চণ্ডিদাসে, বাশুলি আদেশে,
হেরিয়া নখের কোণে।
জনম সফলে, যমুনার কূলে,
মিলায়ল কোনজনে॥"

করিয়াছিলেন*। তাঁহার রচনার কয়েক পংক্তি নিম্নে প্রকটিত হইল ঃ—

"সে যে নাগর গুণধাম। জপয়ে তাঁহারি নাম॥
শুনিতে তাহার বাত। পুলকে ভরয়ে গাত॥
অবনত করি শির। লোচনে ঝরয়ে নীর॥
যদি বা পুছয়ে বাণী। উলাট করয়ে পাণি॥
কহিয়ে তাহারি রীতে। আন না বুঝিব চিতে॥
ধৈরজ নাহিক তায়। বড়ু চণ্ডিদাস গায়॥"

সুবিখ্যাত উইলসন সাহেব কৃত উপাসক-সম্প্রদায় নামক ইংরাজি পুস্তক ও বিদ্যাপতির কবিতা পাঠ করিয়া অবগতি হয়, যে গোবিন্দ দাস কবি, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের সমকাল-বর্ত্তী লোক†। বিশেষত গোবিন্দ দাসের রচনা মধ্যে একস্থলে লিখিত আছে—

"বিদ্যাপতি পদ যুগল সরোরুহ নিসন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর পিবইতে কুরু অনুবন্ধে॥"

* নরহরি দাসের ভণিতায় এইরূপ দৃষ্ট হয় ঃ—
"শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলি বিলাস যে বর্ণিলা বিবিধ মতে।
কবিবর চারু নিরুপম, মত্ত বাশিল যাহার গীতে॥"

† "এত কহি বিবাদ ভাবি বহু মাধব রোই প্রেমে. ভেলা ভোর
"ভনয়ে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস তহি পুরল ইহ রস ওর॥"

এই কবিতা পাঠে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, গোবিন্দ দাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডী বড়ুর পূর্ব্ববর্ত্তী লোক নহেন। এবং তিনি যদি পূর্ব্বোক্ত কবিদ্বয়ের অধিক পরবর্ত্তী লোক হইতেন, তাহা হইলে, বিদ্যাপতির ভণিতায় তাঁহার নাম প্রকাশিত থাকিত না। ভক্তমাল গ্রন্থে ইঁহাকে গোবিন্দ কবিরাজ বলিয়া লিখিত আছে। ঐ পুস্তক পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, গোবিন্দদাস কবিরাজ বুধুরী গ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। ইঁহার প্রণীত কবিতা সকলও নিতান্ত কবিত্বশূন্য ছিল না। নিম্নে কয়েক পংক্তি প্রদত্ত হইল :—

"জনু বাউন করে ধরব সুধাকর পঙ্গুচড়ব গিরি শিখরে।
অন্ধধাই কিয়ে দশদিশে খোজব মিলব কলপতরু নিকরে।
শোনহ অন্ধ করত অনুবন্ধহুঁ ভকত নখর মণি ইন্দু।
কিরণ ঘটায় উদিত ভেল দশ দিশ হাম কি নাপায়ব বিন্দু।
সোই বিন্দু হাম যৈখানে পায়ব তৈখানে উদিত নয়ান।
গোবিন্দ দাস অতয়ে অবধারল ভকত কৃপা বলবান॥"

কবিবর গোবিন্দ দাসের পরে, বোধ হয়, ১৫২৯ খৃঃ অব্দে প্রবল প্রতাপান্বিত মোগলরাজ্য সংস্থাপনকর্ত্তা বাবর শাহের সময়ে জীব গোস্বামী নামা এক ব্যক্তি "করচাই" গ্রন্থ গ্রন্থন করেন। এই পুস্তকের বয়স প্রায় ৩৪০ বৎসর। অনেকে কহিতেন "ত্রিপুরার রাজাবলি" নামক গ্রন্থ অতিপ্রাচীন, কিন্তু সেই পুস্তক "এসিয়াটিক সোসাইটী" নাম্নী সভার দ্বারা পরীক্ষিত হওয়াতে সে ভ্রম দূর হইয়াছে। জীব গোস্বামীর পর, নরহরিদাস, বৃন্দাবন দাস, শেখর রায়, সনাতন, বৈষ্ণব দাস প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় সকলেই চৈতন্যোপাসক ছিলেন। উক্ত ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অনেক সংকীর্ত্তনাদি রচনা করত আপন আপন কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই চৈতন্যের পরবর্ত্তী লোক। এই সকল মহোদয়দিগের মধ্যে বৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্যভাগবত নামক একখানি গ্রন্থ আমাদিগের নয়ন-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়।

সাধারণের দর্শনার্থ এ স্থলে সেই পুস্তকের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল।ঃ—

"অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব অগ্রগণ্য।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যার ভক্তিযোগ ধর্ম্ম॥
এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদিয়ায়।
ভক্তি যোগশূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণ ভক্তি কারো নাই বাসে॥
বাশুলি পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিঞা কেহ যক্ষ পূজা করে॥
পুনরপি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
কৃষ্ণ শূন্য মঙ্গলে নাহি আর সুখ।
বিশেষ অদ্বৈত বড় পান মহা দুখ॥
স্বভাবে অদ্বৈত বড় সারল্য হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তেন হইয়া সদয়॥"

এ স্থলে একটী কথা নিতান্ত অপ্রামাণিক নহে যে, চৈতন্যাবতারের অবতরণের পরেই, চৈতন্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ দ্বারা বঙ্গভাষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কারণ চৈতন্যপদ, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, ভক্তমাল, চৈতন্য-

চরিতামৃত প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ আমাদিগের নয়ন-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই উক্ত সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ দ্বারা রচিত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যাহা হউক, বৃন্দাবন দাসাদির পর ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে প্রজাসুখ সম্বর্দ্ধক সম্রাট আকবরের সময়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ নামক এক ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি "চৈতন্যচরিতামৃত" নামক গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে ৬৮ খানি সংস্কৃত গ্রন্থোদ্ধৃত শ্লোকাবলি ও অন্যান্য উপপুরাণ সমূহের অনেক বচন ও কবিতাদি দেখা যায়। এই পুস্তকে চৈতন্য দেবের আদি, মধ্য, ও অন্তলীলা সুবিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি গৌরাঙ্গ-সহচর রঘুনাথ দাসের শিষ্য ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-রচিত আর একখানি গ্রন্থ এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহার নাম "ভক্তমাল"। ভক্তমালে প্রায় ৪১ খানি সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক দৃষ্ট হয়; এতদ্ভিন্ন অনেকানেক পুরাণাদিরও নামোল্লেখ আছে।

এই গ্রন্থে নাভাজীর নামক পুস্তকের আভাস লইয়া, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, যুগচতুষ্টয়ে প্রাদুর্ভূত বিষ্ণুভক্তদিগের জীবন-চরিত পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভক্তমাল কৃষ্ণদাসের বৃদ্ধাবস্থার রচনা। নিম্নে চৈতন্য-চরিতামৃতের একটী অংশ উদ্ধৃত হইল। এই রচনায় পূর্ব্ববর্ত্তী রচনাবলি অপেক্ষা অল্প হিন্দী শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

"আদিলীলা মধ্যলীলা অন্তলীলা সার।
এবে মধ্যলীলা কিছু করিয়ে বিস্তার॥
অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিক্ষাইল ভক্তি॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেম ভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্যগীত রঙ্গে॥
নিত্যানন্দ গোসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিঁহো গৌড়দেশে ভাসাইল প্রেমরসে॥
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণ প্রেমোদ্দাম।
প্রভু আজ্ঞায় কৈল যাঁহা তাঁহা প্রেমদান॥
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যের প্রিয় যিহোঁ লওয়াইল সংসার॥

চৈতন্য গোসাঞি যাঁরে বলে বড় ভাই।
তিহোঁ কহে মোর প্রভু চৈতন্য গোসাঞি ॥”

চৈতন্য-চরিতামৃত রচনার পর কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রচারিত হয়। প্রকৃত গুণ ধরিয়া বিবেচনা করিলে কৃত্তিবাস বঙ্গদেশের প্রথম কবি। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ নানা ভাব-পরিপূরিত সুদীর্ঘ গ্রন্থ প্রায় কেহই রচনা করিয়া যান নাই। রামায়ণ পাঠে অবগতি হয় যে, কৃত্তিবাস নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি শান্তিপুরের সন্নিকটে ফুলিয়া গ্রামে বাস করিতেন*। তাঁহার ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম †। তিনি কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডের এক স্থলে “কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি” বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। কৃত্তিবাস কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ-রচিত চৈতন্য-

---

* “ফুলিয়ার কৃত্তিবাস গায় সুধাভাণ্ড।
রাবণেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড ॥”
রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড।

† “রামদরশনে মুনি, যান স্বর্গবাস।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস ॥”
রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড।

চরিতামৃতের পরবর্ত্তী লোক ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, প্রায় ৩০০ শত বৎসর হইল, তিনি এ দেশে বিদ্যমান ছিলেন*। এটী সত্য হইলে অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে কৃত্তিবাস, সম্রাট আকবরের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ এক্ষণে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। উহা ১৮০২ খৃঃ অব্দে মিশনরিদিগের দ্বারা শ্রীরামপুরে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা বটতলায় যন্ত্রিত যে রামায়ণ কৃত্তিবাসের বলিয়া বিক্রীত হয়, উহা ৺ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় দ্বারা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের অব্যবহিত পরে বা তৎ সমকালেই কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর কবিত্ব যশোপ্রভা প্রকাশিত হয়। তিনি বাদশাহ জাঁহাগীরের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। বর্দ্ধমানের অন্তর্ব্বর্ত্তী দামুন্যা-গ্রামে তাঁহার

* আনুমানিক ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে কৃত্তিবাস জীবিত ছিলেন। ইহাতে বোধ হইতেছে, তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজের সমকালবর্ত্তী লোক।

ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের বাসস্থান ছিল*। মুকুন্দ-রামের পিতার নাম হৃদয়মিশ্র, ও পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র। এ স্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, চক্রবর্ত্তী কবির পিতৃ-পিতামহাদির মিশ্র উপাধি হইবার কারণ কি? কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে জানিতে পারি-বেন যে, কবিবরের মিশ্রই প্রকৃত উপাধি ও চক্রবর্ত্তী ডাক উপাধি মাত্র। তাঁহার গ্রন্থোৎ-পত্তি বিবরণ পাঠে অবগতি হয় যে, কবিবর জীবদ্দশায় অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। কথিত আছে, শঙ্করমোহিনী চণ্ডী স্বপ্নযোগে তাঁহাকে পদ্য রচনার্থ আদেশ করেন, কিন্তু সে বিষয় কত দূর সত্য, তাহা আমরা অবগত নহি। যাহা হউক, তিনি নানা স্থান পর্য্যটন ও দুঃখ-বাত্যা সহ্য করত পরিশেষে বাঁকুড়ার পূর্ব্বাধিকারী আড়রা নামক স্থানের রাজা রঘুনাথ রায়ের নিকট

---

* "সহর শিলিমাবাজ, তাহাতে সুজন রাজ,
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাহার তালুকে বসি, দামুন্যায় করি কৃষি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥"

আপনার দুঃখ ও স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনানন্তর নিজ রচিত কবিতা পাঠ করেন। রাজা রচনা শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া রচয়িতার ভরণপোষণ জন্য দশ আড়া ধান্য প্রদান করিয়াছিলেন। এবং নিজ পুত্রের শিক্ষাগুরু-পদে অভিষিক্ত করেন। এইরূপে কবিবর দুরবস্থা হইতে নিস্কৃতি লাভ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি রাজার আজ্ঞায় উৎসাহিত হইয়া "চণ্ডী" কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থ প্রায় ২৬০ বা ২৭০ বৎসর হইল রচিত হইয়াছে। ইহাতে রামায়ণ অপেক্ষা অধিক কবিত্ব শক্তি দৃষ্ট হয়। মুকুন্দরাম নিজে দরিদ্র ছিলেন, সুতরাং তাঁহার রচনা মধ্যে দুঃখীগণের ক্লেশ বর্ণনায় অধিক ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। স্বভাব বর্ণনায়ও তিনি কৃত্তিবাস অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না। বঙ্গীয় কবিগণের জীবনী লেখক মহোদয়গণ ইঁহাকে প্রথম প্রহেলিকা রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আদি কবি বিদ্যাপতির

রচনাতেও প্রহেলিকা দেখা যায়,অতএব আমরা চক্রবর্ত্তী কবিকে উপরোক্ত প্রশংসা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হই।

চণ্ডীর পর "কালিকামঙ্গল" নামক গ্রন্থ রচিত হয়। প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী ইহার প্রণেতা। এ ব্যক্তি কে? কোথায় জন্ম? তাহা অবগত হইবার কিছু মাত্র উপায় নাই। কালিকামঙ্গলে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ কোন বঙ্গীয় কবির মনঃকল্পিত নহে। রাজা বিক্রমাদিত্যের একজন সভাসদ্ বররুচি-বিরচিত সংস্কৃত গ্রন্থের ভাব গ্রহণ করিয়া প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী প্রথমতঃ উহা রচনা করেন। তৎপরে পুনরায় প্রথমোক্ত গ্রন্থ হইতে বিখ্যাত রামপ্রসাদ সেন বিদ্যাসুন্দর লিখেন। মূলের সহিত এই দুই গ্রন্থের অনেক সাদৃশ্য আছে। পরিশেষে উক্ত প্রসাদী বিষয় অবলম্বন করিয়া বঙ্গকবিকুল-শেখর ভারতচন্দ্র রায় বর্ত্তমান প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। কিন্তু তিনি মূলের প্রতি বড় দৃষ্টি

রাখেন নাই। তিনি যে ধূয়া প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাব্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, উহা প্রথমতঃ প্রাণরামচক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে। কালিকামঙ্গলের পর কাশীরামদাসের মহাভারত প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থ প্রায় দুইশত বৎসর হইল রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা বঙ্গভূমে কাশীদাস নামে বিখ্যাত, কিন্তু ভণিতা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তাঁহার প্রকৃত উপাধি দেব। এই বাক্যের সত্যতা প্রমাণার্থ মহাভারত হইতে দুইটী পংক্তি উদ্ধৃত হইল। যথা ঃ—

"চন্দ্রচূড়পদদ্বয় করিয়া ভাবনা,
কাশীরাম দেবে করে পয়ার রচনা।"

যদি তাঁহার "দেব" উপাধি না হইত, তাহা হইলে কখনই নামের পরে ঐ পদবীটী সংলগ্ন করিতে পারিতেন না। তাঁহার রচনাপাঠে অবগতি হইতেছে যে, তিনি ইন্দ্রাণীনাম্নী স্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী সিদ্ধগ্রামে বসতি করিতেন। ইন্দ্রাণী হুগলী জেলার মধ্যস্থিত। তাঁহার পিতার

নাম কমলাকান্ত দেব ও পিতামহের নাম সুধাকর দেব। কাশীরাম দেব একজন পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন এবং অনেকে অনুমান করেন যে, কৃষ্ণ প্রীত্যর্থই মহাভারত রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থকর্ত্তা নিজ কবিত্বশক্তি প্রকাশ বা যশোকীর্ত্তি স্থাপনার্থ ইহার প্রণয়নে রত হন নাই। বস্তুতঃ মহাভারতের রচয়িতা কৃত্তিবাসের ন্যায় 'আমি পণ্ডিত' 'আমি কবি' ইত্যাদি গর্ব্বব্যঞ্জক শব্দ কলাপ লিখিয়া ভদ্র জনোচিত কার্য্যের বৈপরীত্য দর্শান নাই। তাঁহার রচিত ভারতের প্রত্যেক স্থানে নম্রতাব্যঞ্জক বর্ণসমূহ লক্ষিত হয়। দেব কবির ছন্দপ্রণালী পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ অপেক্ষা বিশুদ্ধ। কিন্তু কবিত্বগুণে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিলেন। একটী জন-প্রবাদ যে, কাশীরাম দেব ভারত লিখিতে আরম্ভ করিয়া বিরাটপর্ব্ব শেষ করিতে না করিতেই জীবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুকালে আরব্ধ ভারতের অবশিষ্টাংশ রচনার ভার নিজ জামাতার প্রতি অর্পণ করিয়া যান। কতকগুলি লোক এই বিব-

রণের প্রতিবাদী। কিন্তু উভয় দলই নিজ নিজ পক্ষসমর্থন জন্য অনেক প্রমাণ দিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় যে,তাঁহাদিগের কোন্ সম্প্রদায়ের কথা সত্য, তাহা জানিবার উপায় নাই। যে মহাত্মার লেখনী সহস্রাধিক পত্রাঙ্কবিশিষ্ট এক মহা কাব্য রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য সমাজের এত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন; যে মহাজন সংস্কৃতানভিজ্ঞ ভারতামৃতপিপাসী বাঙ্গালিগণের ঔৎসুক্য-পিপাসা দূর করিয়াছেন; যে পণ্ডিত-বরের কাব্য অবলম্বন করিয়া সহস্র সহস্র গায়ক ও মুদ্রাঙ্কণকারীগণ বহুল ধন অর্জ্জন করিয়া নিজ নিজ পরিবারের ভরণপোষণ করিতেছে, পরি-তাপের বিষয়! সেই মহদ্ব্যক্তির প্রকৃত জীবনী আমাদিগের অবগত হইবার উপায় নাই। কাশীদাসী মহাভারত এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য নহে, সুতরাং তাহা হইতে এস্থলে কোন বিষয় গৃহীত হইল না, কিন্তু তাহাতেও রামায়ণের ন্যায় অনেক স্থান পরিবর্ত্তিত ও সংযোজিত হইয়াছে।

তাহার পর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের প্রাদুর্ভাব হয়। রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর ও কালীসংকীর্ত্তনের নিমিত্ত বঙ্গভূমে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া যান। তিনি আনুমানিক ১৬৪৪ বা ১৬৪৫ শকে (১৭২২ বা ১৭২৩ খৃঃ অঃ) রামরাম সেনের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নিজের বর্ণনায় অবগতি হয় যে, তিনি একজন অতি সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বংশজাত। কালক্রমে ঐ বংশের ঐশ্বর্য্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, তথাপি রামপ্রসাদের পিতা নিতান্ত নিঃস্ব ছিলেন না। তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে বিদ্যালোকে আলোকিত করিতে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, কারণ অনুমিত হইয়াছে, রামপ্রসাদ সেন সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ও হিন্দী অতি উত্তমরূপ জানিতেন, এবং তদীয় ভ্রাতৃবর্গও নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন না। যাহা হউক, রামপ্রসাদের প্রথমাবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। তিনি নিজ মাতৃভূমি হালিসহরের অন্তবর্ত্তী কুমারহট্ট গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার কোন

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্নিধানে মুহুরীর পদে নিযুক্ত হন। কিছু দিন পরে তৎ প্রভু তাঁহার রচনা ও বিষয়-বিরাগতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত মনে ইষ্টদেবতার ধ্যান ও কবিত্ব যশঃপ্রভা বিকীর্ণ করিবার জন্য মাসিক ত্রিংশৎ মুদ্রা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। কবিবরও প্রভুর এইরূপ অমায়িকভাবে অনুগৃহীত হইয়া নিজ জন্মস্থান কুমারহট্টে প্রস্থান করিলেন। তথায় বৈষয়িক ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া সংকীর্ত্তনাদি রচনায় নিযুক্ত থাকিতেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেই সময় বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার বায়ু সেবনার্থ কখন কখন কুমারহট্টে শুভাগমন হইত। এক দিবস তিনি গুণবন্ত রামপ্রসাদ সেনের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে নিজ সন্নিধানে আহ্বান করেন। রামপ্রসাদ কাব্যপ্রিয় নরপতিকে স্বরচিত কবিতা পাঠ ও সুমধুর সংগীত দ্বারা পরিতুষ্টকরত "কবিরঞ্জন" উপাধির সহিত উপযুক্তরূপ পুরস্কৃত হন। রামপ্রসাদও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ বিদ্যাসুন্দ-

রের উপাখ্যান গ্রহণ করিয়া "কবিরঞ্জন" নামধেয় একখানি অভিনব কাব্য তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন।

যাহা হউক, জীবনের শেষাংশ তিনি অতি সুখে অতিবাহিত করিয়া ১৬৮০ বা ১৬৮৪ শকে (১৭৫৮ বা ১৭৬২ খৃঃ অঃ) ভবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি কৌলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তজ্জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুরাপান করাও অভ্যাস ছিল। ভবমণ্ডলের কি বিচিত্র গতি! এমন কোন জাতি দৃষ্ট হয় না, যাহাদিগের কবিগণ (দুই এক জন ভিন্ন) দরিদ্র নহেন। ইতিবৃত্ত পাঠে অবগতি হয়, কবি-গুরু বাল্মীকির অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল; পারসিকদিগের মহাকবি হাফেজও লক্ষ্মীর প্রিয়পুত্র ছিলেন না; ইউরোপীয় মহাকবিকুল-নায়ক সেক্সপিয়র, বায়রণ প্রভৃতিরও অবস্থা প্রথমে উন্নত ছিল না, কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! তাঁহারা বিলাসপ্রিয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অপদস্থ ও ঘৃণিত হইয়াও,—প্রথমে সাধারণের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়াও নিজ নিজ স্বাধীন

লেখনীর প্রভাবে পরে যে অক্ষয় খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন, সহস্র সহস্র অর্থ ও লোক-বল সহায়সম্ভূত বিলাস দ্রব্য দ্বারা নশ্বর ইন্দ্রিয় সকল চরিতার্থ করিয়াও ধনিগণ সেই অবিনশ্বর খ্যাতির শতাংশের একাংশেরও অধিকারী হইবার উপযুক্ত নহেন। কবিরঞ্জনের সমকালে আজু গোসাঞী নামক এক ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার জীবনী অত্যন্ত অপ-রিজ্ঞেয়। অনেকে অনুমান দ্বারা স্থির করিয়া-ছেন যে, কুমারহট্টের নিকটেই তাঁহার বাসস্থান ছিল। যখন কাব্যপ্রিয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঐ স্থানে বায়ুসেবনার্থ গমন করিতেন, কথিত হইয়াছে, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন তখন রাজ সমীপে থাকিতেন। এই সময়ে আজু গোসাঞী ও রামপ্রসাদের কবিতা দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তর হইত। রামপ্রসাদ যে কোন বিষয় রচনা করিতেন, আজু গোসাঞী দ্বারা তৎক্ষণাৎ একটী তাহার উত্তর প্রস্তুত হইত। তাঁহার দ্রুত রচনার বিশেষ ক্ষমতা ছিল, পরিতাপের বিষয় এই যে, তৎ-

প্রণীত কোন কাব্য-কুসুম আমাদিগের নয়নগোচর হয় না। এ স্থলে তাঁহার রচনা-শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। একদা কবিরঞ্জন দ্বারা এইরূপ গীত হইয়াছিল। যথাঃ—

" শ্যামা মা ভাব-সাগরে ডোবনারে মন ‼
কেন আর বেড়াও ভেসে———"

আজু গোসাঞী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন। যথা ঃ—

" একে তোমার কোফো নাড়ী,
ডুব দিও না বাড়াবাড়ি,
হলে পরে জ্বর জ্বাড়ি,
যেতে হবে যমের বাড়ী।"

কবিরঞ্জন একদিন এইরূপ কহিয়াছিলেন, যথা ঃ—

" কর্ম্মের ঘাট, তেলের কাট, আর পাগলের ছাট, মলেও যায় না।"

আজু গোসাঞী কর্তৃক এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল। যথা ঃ—

" কর্ম্মডোর, স্বভাব-চোর, আর মদের ঘোর, মলেও যায় না।"

এই সকল রচনা পাঠে অবগতি হয় যে, আজু গোসাঞী একজন অতি উপযুক্ত ও প্রকৃত ভাবুক ছিলেন। বঙ্গভূমির কি দুরদৃষ্ট! যাঁহারা স্বদেশের উন্নতির নিমিত্ত কত শত দিন নিরাহারে, কত শত যামিনী অনিদ্রায় যাপন করিয়া অনেকানেক সুদীর্ঘ গ্রন্থ সকল রচনা করত বঙ্গসাহিত্যসমাজকে পুষ্টাঙ্গ করিয়াছিলেন; যাঁহারা বঙ্গসমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি, দুঃখের বিষয়, সেই সকল মহাত্মাদিগের জীবন-বৃত্তান্ত অতিশয় অপরিজ্ঞেয়। অস্মদ্দেশে, অন্যান্য সভ্যজাতির ন্যায় নিজ নিজ জীবন-বৃত্তান্ত রাখিবার রীতি না থাকাতেই কেবল এইরূপ ঘটিয়াছে।

কবিরঞ্জন ও আজু গোসাঞীয়ের পর কত শত মাহাত্মা আবির্ভূত হইয়া নিজ নিজ রচনা-কুসুম বিকাসিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, অনেকে সফলপ্রযত্ন হইয়াও নিবিড়ারণ্য শোভাকর প্রসূনের ন্যায় সাধারণের অজ্ঞাতাবস্থাতেই অথবা কতকগুলি কাব্য-কানন-বাসি ঋষির

চিত্ত-রঞ্জন হইয়াই মুদিত হইয়া গিয়াছে! রামপ্রসাদ ও আজু গোসাঞীয়ের পরবর্ত্তী রচয়িতাগণের বিষয় অনুসন্ধান করিলে বঙ্গ-কবি-কেশরী গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় মহোদয় আমাদিগের স্মরণ-পথের পথিক হন। অতএব তাঁহারই বিষয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। এস্থলে গুণাকর কবির পরিচয়-সূচক কয়েকটী কবিতা তাঁহার প্রণীত "সত্যনারায়ণের কথা" নাম্নী রচনা হইতে উদ্ধৃত হইল। যথা :—

"ভরদ্বাজ অবতংশ, ভূপতি রায়ের বংশ,
সদা ভাবে হত কংস, ভূরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতী যুত.
ফুলের মুখুটী খ্যাত, দ্বিজ পদে সুমতি॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুনসী!
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশগায়,
হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী॥"

পূর্ব্বোক্ত রচনাংশ পাঠ করিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, গুণাকর ভারতচন্দ্রের পিতার

নাম নরেন্দ্র নারায়ণ রায়। তিনি বর্দ্ধমান প্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভুরস্নুট পরগণাস্থিত পাণ্ডুয়া গ্রামে অবস্থিতি করিতেন। জাত্যংশে অতি উৎকৃষ্ট ছিলেন, একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার ফুলের মুখুটি। অর্থাংশেও বড় ন্যূন ছিলেন না। কারণ যে স্থলে তাঁহার বাসস্থান ছিল, অদ্যাপিও সেই ভূমিখণ্ড "পেঁড়োর গড়" নামে বিখ্যাত; এবং সেই স্থানের ভগ্নাংশ সকল দর্শন করিয়া অনুমান হয়, কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি তাহার অধিকারী ছিলেন। যাহা হউক, তিনি যে, সে সময়ের একজন বিখ্যাত ধনাঢ্য ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কিছুকাল পরে বর্দ্ধমানাধিপের * কোপানলে পতিত হইয়া, সমুদয় ঐশ্বর্য্য নষ্ট করত অতি ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার চারি পুত্র ছিল; চতুর্ভুজ, অর্জ্জুন, দয়ারাম, এবং ভারতচন্দ্র ক্রমান্বয়ে জন্ম পরিগ্রহ করেন। যদিও ভারতচন্দ্রকে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ বলিয়া

---

* কীর্ত্তিচন্দ্র রায় এই সময়ে বর্দ্ধমানের রাজা ছিলেন।

বর্ণিত হইল যথার্থ, কিন্তু তিনি কি মহীয়সী শক্তি লইয়াই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন যে, তাহারই প্রভাবে, মহাজন-গণনীয়া তালিকা মধ্যে তাঁহারই নাম তদীয় ভ্রাতৃবর্গ ও পিতা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্থানে নিবেশিত হইয়াছে। এই মহাত্মা ১৬৩৪ শকে জন্মগ্রহণ করেন। যখন ইঁহার পিতা অসহনীয় দুরবস্থারূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েন, ভারতচন্দ্র সেই সময়ে পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করত মণ্ডলঘাট পরগণার মধ্যবর্ত্তী নওয়াপাড়া গ্রামে (মাতুল ভবনে) বাস করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রামের নিকটবর্ত্তী তাজপুর নামক স্থানই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার প্রথম স্থান। এই গ্রামে তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গুরুতর পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধান সমাপন পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হন। এই সময়ে তাজপুরের নিকটবর্ত্তী শারদা গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহে কবিবরের ভ্রাতৃগণ সন্তুষ্ট না হইয়া বরং তাঁহাকে

তিরস্কার করিয়াছিলেন। তেজস্বী ভারতচন্দ্র মনোবেদনায় প্রপীড়িত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, "যতদিন আমি অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম না হইব, ততদিবস গৃহে প্রত্যাগমন করিব না।" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তিনি প্রথমতঃ হুগলী জেলার অন্তঃপাতি বাঁশবেড়িয়ার পশ্চিম দেবানন্দপুরের রামচন্দ্র মুন্সী নামক জনৈক সদাশয় ধনাঢ্য কায়স্থের আশ্রিত হইয়া, পারস্যভাষা শিক্ষার্থ যত্নশীল হন। এই সময়ে তাঁহার সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। এমন কি, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা সকল অত্যল্প সময়মধ্যে রচনা করিতে পারিতেন। এই সময়েই তিনি বঙ্গভাষায় দুইখানি "সত্যনারায়ণের পুথি" রচনা করেন। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লেখকেরা বর্ণনা করিয়াছেন,—এই সময়ে তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষের অধিক ছিল না। যে সময়ে বঙ্গভূমির অবস্থা অত্যন্ত মন্দ এবং এতদ্দেশীয়গণের বিদ্যাশিক্ষার পথ অত্যন্ত পঙ্কিল থাকায়,

ভারত কাব্যোদ্যানের বৃক্ষ সকল নানা ঝঞ্ঝা-বাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল, সেই সময়ে, এত নবীন বয়সে এইরূপ বিদ্যা ও রচনাশক্তি-সম্পন্ন হওয়া সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! যাহাহউক, ভারতচন্দ্র পারস্য ভাষায় সম্যকরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রায় বিংশতি বৎসর বয়সে পুনর্ব্বার জন্মভূমিতে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার ভাতৃবর্গকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, পিতৃকৃত ইজারা ভূমি সমূহের গোলযোগ নিষ্পত্তি করণার্থ মোক্তারী পদগ্রহণ পূর্ব্বক বর্দ্ধমানে যাত্রা করেন। সেই কার্য্য তৎ কর্ত্তৃক অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্তু ভ্রাতৃগণ উপযুক্ত সময়ে রাজস্ব প্রেরণে সক্ষম না হওয়াতে বর্দ্ধমানাধিপ সেই সকল ভূসম্পত্তি নিজ প্রভুত্বাধীন করিয়া লইলেন। ভারতচন্দ্র তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলে, দুষ্টমতি রাজকর্ম্মচারিগণ চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে কারা-রুদ্ধ করে। কিন্তু দয়া-ধর্ম্ম-প্রিয় কারাধ্যক্ষ তাঁহাকে গোপনে নিষ্কৃতি প্রদান করেন। ভারত-

চন্দ্র এইরূপ অনুগৃহীত হইয়া তথা হইতে কটক যাত্রা করেন। তখন কটক মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকার ভুক্ত ছিল, এবং শিবভট্ট নামক একজন সদাশয় ব্যক্তি সেই স্থানের সুবাদার ছিলেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া ভারতচন্দ্রকে আশ্রয় দান পূর্ব্বক পুরুষোত্তম ধামে বাসকরণোপযোগী সমুদায় দ্রব্য প্রদানার্থ কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ প্রদান করেন। ভারতচন্দ্র কিয়দ্দিবস পরে বৃন্দাবন গমনাভিলাষে পুরুষোত্তম হইতে বহির্গত হইলেন, কিন্তু খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলে তাঁহার ভায়রাভাই তদীয় বৈরাগ্য ভাব দর্শন করত, অনেক প্রকার প্রবোধ বাক্য দ্বারা তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তন করিলেন। সুতরাং বৃন্দাবন যাত্রা স্থগিত হইল, এবং কিছুকাল শ্বশুরালয়ে অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর তিনি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান বাবু ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্যে নবদ্বীপাধিপতি সুবিখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট পরিচিত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কাব্যপ্রিয়তাগুণে

অদ্বিতীয় ছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিকট গুণাকর ভারতচন্দ্রের ন্যায় সুকবির কখনো কি অনাদর হইবার সম্ভাবনা? কখনই নহে। রাজা তাঁহার কবিত্বগুণে মোহিত হইয়া "গুণাকর" উপাধির সহিত ৪০ টাকা বেতনে নিজ সভায় নিযুক্ত করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষানুগ্রহ ও উৎসাহে ভারতচন্দ্র প্রথমত অন্নদামঙ্গল রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং তাহার কিছুকাল পরে বিদ্যাসুন্দর রচিত হয়। অনেকে কহিয়া থাকেন, ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানাধিপের পূর্ব্বকৃত অত্যাচার বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, তজ্জন্যই তিনি উক্ত রাজবংশের গ্লানি-সুচক বিষয় অবলম্বন করত বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। একথা নিতান্ত অপ্রামাণিক নহে, কবিবরের জীবনী ও বিদ্যাসুন্দর মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনায়াসেই সেই ভাব উপলব্ধি হয়। কিন্তু ইহা যে পূর্ব্ববর্ণিত সংস্কৃত গ্রন্থের আভাস লইয়া রচিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারিবেন না। বিদ্যাসুন্দর রচনার পর ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরী

রচনা করেন। ইহাতে আদিরস বর্ণিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র এই রচনায় বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকের এইরূপ মন্তব্য যে, লেখকের রচনা দেখিয়া তাঁহার আন্তরিক ভাব জ্ঞাত হওয়া যায় অর্থাৎ যাঁহার যে বিষয়ে অধিক আসক্তি তিনি স্বকীয় রচনা মধ্যে তাহা প্রায়ই ব্যক্তকরিয়া ফেলেন। একথা সত্য ; কিন্তু ভারতচন্দ্র সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি যেমন সুরসিক ছিলেন, তেমনি তাঁহার চরিত্র কলঙ্ক বিবর্জ্জিত ছিল। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন সুরাশক্ত ছিলেন, কিন্তু গুণাকর নিজ চরিত্রকে সে দোষে কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি জীবনের শেষাংশ মূলাযোড় গ্রামে অতিবাহিত করেন। অন্নদামঙ্গল,রসমঞ্জরী ও বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত তৎ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্র রায় ইহলোক পরিত্যাগ করিবার কিছু পূর্ব্বে চণ্ডীনাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহা সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় নানা-

লঙ্কারেভূষিত হইয়া রচিত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদিগের দুরদৃষ্টবশতঃ গ্রন্থখানি শেষ না হইতে হইতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৬৮২ শকে কবিবর ভারতচন্দ্র নশ্বর তনু ত্যাগ করেন।

ইঁহার সমকালে রাধানাথ নামক এক ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন। সে ব্যক্তি কে? কোথায় বসতি, তাহা জানিবার উপায় নাই। তিনিও কবিত্ব শূন্য ছিলেন না, বিদ্যাসুন্দরের কোন অংশে তাঁহার রচনা দৃষ্ট হয়। গুণাকর ভারত-চন্দ্রের পর রামনিধি গুপ্ত* আমাদিগের বর্ণ-নীয় বিষয় হইতেছেন। তিনি ১১৪৮ সালে কলিকাতার অন্তঃপাতি কুমারটুলি পল্লিতে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির' অধীনে অনেক প্রধান প্রধান কর্ম্ম করিয়াছি-লেন। আদিরস বর্ণনায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তৎপ্রণীত সঙ্গীত সমূহ এখনো বঙ্গ-সমাজের আদরণীয় পদার্থ মধ্যে গণ্য হইয়া আসিতেছে। অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র মহো-

---

* ইনি নিধুবাবু নামে বিখ্যাত।

দয়গণকেও আহ্লাদের সহিত নিধুবাবুর টপ্পা শ্রবণ করিতে দেখা যায়। তিনি ১২৪৫ সালে ৯৭ বৎসর বয়সে তনু ত্যাগ করেন। সঙ্গীত ভিন্ন তাঁহার প্রণীত অন্য কোন গ্রন্থ আমাদিগের নয়নগোচর হয় না, রামনিধি গুপ্ত জীবিত থাকিতে থাকিতেই মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রচনা-কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। এই মহোদয় ১২২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়, পিতামহের নাম কৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়। নদীয়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী বিল্বগ্রামে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের বাসস্থান ছিল। তিনি বাল্যকালে প্রথমতঃ গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া রামদাস ন্যায়রত্ন সমীপে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। তৎপরে কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজে ১৫ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী হন। কালেজ পরিত্যাগের সময় অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে তর্কালঙ্কার উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ইংরাজি ভাষায়ও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল।

তিনি পঠদ্দশাতেই "বাসবদত্তা" কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থ বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ রত্ন-বর বররুচির ভাগিনেয় সুবন্ধু কর্ত্তৃক প্রথমত সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় সেই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বঙ্গভাষায় এক সুবিস্তৃত কবিত্ব পরিপূরিত কাব্য প্রণয়ন করেন। গ্রন্থাবতারিকা মধ্যে লিখিত আছে যে, "এই গ্রন্থ যশোহর জেলার অন্তঃপাতি ইসফ্‌পুর পরগণাস্থ নওয়াপাড়া গ্রাম নিবাসী কালীকান্ত রায়ের অনুমত্যনুসারে রচিত হয়।" ক্ষণে (১৮৭০ খৃঃঅঃ) বাসবদত্তার বয়ঃক্রম প্রায় ২১ বৎসর হইয়াছে। তাঁহার পঠদ্দশায় প্রণীত দ্বিতীয় পুস্তকের নাম "রসতরঙ্গিণী" ইহাতে কতগুলি সংস্কৃত উদ্‌ভট কবিতার অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার রচনা প্রণালী বাসবদত্তা অপেক্ষা উত্তম, কিন্তু বর্ণিত বিষয় অত্যন্ত অশ্লীল। পিতা পুত্রে এক স্থানে পাঠ করিবার উপযুক্ত নহে। তর্কালঙ্কার মহাশয় কালেজ হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট পাঠ-

শালায় ১৫ টাকা বেতনে শিক্ষকতা কার্য্যে নি-
যুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে ২৫ টাকা বেতনে
বারাসত ইংরাজী-বঙ্গ-বিদ্যালয়ের পণ্ডিত হন।
কিছু দিন পরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কলি-
কাতা ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের দেশীয়ভাষার
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর
৫০ টাকা বেতনে কৃষ্ণনগর কালেজের প্রধান
পণ্ডিতের আসন গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে
সেস্থান হইতে পুনর্ব্বার কলিকাতা সংস্কৃত
কালেজের সাহিত্যাধ্যাপক হন। এই সময়ে
বালক বালিকার পাঠ্য পুস্তকের অভাব দেখিয়া
তিনি ক্রমান্বয়ে তিন ভাগ শিশুশিক্ষা প্রণয়ন
করেন। ইহার পূর্ব্বে বালকবালিকাগণের
প্রথম পাঠোপযুক্ত সুপ্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ প্রায় ছিল
না, তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহার প্রথম অভাব
মোচন করেন। তাঁহার পুস্তকের আদর্শ
লইয়া এখন অনেকেই উক্তবিধ গ্রন্থ সকল
প্রণয়ন করিতেছেন ও করিয়াছেন। যাহাহউক,
তিনি কখনো একস্থানে দীর্ঘকাল কার্য্য করেন

নাই। সংস্কৃত কালেজে কিছুকাল অধ্যাপকতা করিয়া ১২৫৬ সালে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে বহরমপুরের জজ্‌পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। সর্ব্বশেষে কান্দী মহকুমার ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। জীবনের অবশিষ্টাংশ ঐ স্থানে সুখে অতিবাহিত করিয়া ১২৬৪ সালে প্রাণ ত্যাগ করেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সমকালে অথবা অব্যবহিত পরেই রামবসু, হরুঠাকুর, বাসুসিংহ, নিত্যানন্দ বৈরাগী প্রভৃতি কয়েক জন কবিওয়ালা প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহই উপযুক্তরূপ বিদ্যালোকসম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের রচিত সঙ্গীতমালায় বিশেষ কবিত্ব-জ্যোতি লক্ষিত হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে রামবসু সাধারণের নিকট অধিক পরিচিত, সুতরাং তাঁহার বিবরণ এস্থলে কিঞ্চিৎ প্রকটিত হইলঃ—তিনি ১১৯৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতার অপরপারস্থ সালিখা নাম্নী গ্রামে

জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্গীত রচনায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ১২৩৬ সালে ৪২ বৎসর বয়সে তিনি গতায়ু হন। তাঁহার রচনা-কুসুম অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের অমনোযোগিতা দোষে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় সেই সকল সুভাব সঙ্গীত নিকর সংগ্রহার্থ যত্নবান হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদিগের ভাগ্যদোষে তিনিও অকালে কালকবলিত হন। এক্ষণে কোন কোন মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া রামবসুর বিলুপ্ত রচনার অনেকাংশ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত এক অংশ আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত এস্থলে গ্রহণ করিলাম। যথাঃ—

(ঠাকরুণ বিষয়।)

"ওহে গিরি গাতোল হে মা এলেন্ হিমালয়।
উঠ দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গাকর কোলে,
মুখে বলো জয় জয় দুর্গা জয়॥
কন্যাপুত্র প্রতি বাঞ্ছল্য, তায় তাচ্ছল্য, করা নয়;

আঁচল ধরে তারা ঃ—
বলে, ছিমা, কিমা, মাগো, ওমা.
মাবাপের কি এমনি ধারা!
গিরি তুমি যে অগতি, বোঝে না পার্ব্বতী,
প্রসূতির অখ্যাতি জগৎময়।"

এক্ষণে কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি নামক জনৈক ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। তিনি নবদ্বীপাধিপতি গিরিচশন্দ্র রায়ের* সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজা তাঁহার উপস্থিত বাক্‌পটুতা ও সুরসিকতায় প্রীত হইয়া "রসসাগর" উপাধি প্রদান করেন। রসসাগরের অতিশয় দ্রুতরচনায় ক্ষমতা ছিল, এমন কি, কোন প্রশ্ন করিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর পদ্যে প্রদান করিতে পারিতেন। একদা রাজাকর্ত্তৃক এইরূপ প্রশ্ন প্রদত্ত হয়। যথা ঃ—

"গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।"

রসসাগর অধিকক্ষণ চিন্তা না করিয়াই এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন। যথা ঃ—

"মহারাজ রাজধানী, নগর বাহির।
বারইয়ারি মা ফেটে হলেন চৌচির॥

*ইনি মৃত নবদ্বীপাধিপতি সতীশচন্দ্র রায়ের পিতামহ।

ক্রমে ক্রমে খড় দড়ী, হইল বাহির।
গাভীতে ভক্ষণ করে, সিংহের শরীর।"

তিনি এইরূপ কত শত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন,তাহার সংখ্যা করা যায় না। হিন্দীভাষাতেও তাঁহার ঐরূপ নৈসর্গিক ক্ষমতা ছিল। তাঁহার প্রণীত কোন পুস্তক আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই।

এক্ষণে কবিবর ঈশ্বরগুপ্ত আমাদিগের বর্ণনার বিষয় হইতেছেন। ১২১৬ সালে কলিকাতার ১৪ ক্রোশ উত্তর কাঁচড়াপাড়া গ্রামে হরিনারায়ণ গুপ্তের ঔরসে গুপ্ত কবির জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি কোন বিখ্যাত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু শৈশবকাল হইতেই তাঁহার কবিতা রচনায় বিশেষ অনুরাগ ছিল। বাল্যকাল (প্রায় ছয় বৎসর বয়ঃক্রম) হইতে তিনি কলিকাতায় মাতুলালয়ে বাস করিতেন। ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ হইতে তিনি প্রথমতঃ সাপ্তাহিক নিয়মে "সংবাদ প্রভাকর" প্রচারণে প্রবৃত্ত হন। কিছু দিন পরে সপ্তাহে

তিনবার ও পরিশেষে বর্ত্তমান প্রাত্যহিক নিয়মে 'প্রভাকর' প্রচারিত হয়। সেই সময়ে তিনি কবিত্বশক্তির পরিচয় দিবার নিমিত্ত আর এক-খানি মাসিক প্রভাকর প্রচার করেন। তাহা কেবল নানা বিষয়িণী কবিতামালায় পরিপূরিত থাকিত। "সাধুরঞ্জন" ও "পাষণ্ড-পীড়ন" নামে আর দুইখানি সাপ্তাহিক পত্র তৎ কর্ত্তৃক সম্পা-দিত হইত। কবিবর সাধুরঞ্জনকে নানা প্রকার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সমূহে ভূষিত করিতেন। পা-ষণ্ড-পীড়নেও ঐরূপ বিষয় সকল লিখিত হইত। কিন্তু সেই সময়ে মাননীয় ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের সহিত ঈশ্বর গুপ্তের বিবাদ হওয়াতে শেষোক্ত পত্রখানিতে অশ্লীল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছিল। কবিবর এই সকল পত্র সম্পাদন করিয়া যে অবকাশ পাইতেন, তাহাও বঙ্গ-সাহিত্যোন্নতি সাধক বিষয়ে অতিবাহিত করিতেন। তিনি দশ বা দ্বাদশ বৎসর নানা স্থান পর্য্যটন করত ভারতচন্দ্র, কবিরঞ্জন, রামনিধি গুপ্ত, হরু-

ঠাকুর, রামবসু ও নিতাইদাস প্রভৃতি মৃত কবিগণের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন। সেই-গুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল। কেবল ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত তিনি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রম বলে অস্মদ্দেশের ও বঙ্গ-সাহিত্যসংসারের যে উপকার সাধিত হইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আমাদিগের সকলেরই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

"প্রবোধ প্রভাকর" নামক তিনি একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাহাতে জীব-তত্ত্ব-বিষয়ক প্রসঙ্গ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেই পুস্তকের রচনাপ্রণালী অনেকাংশে প্রাঞ্জল। তাহা ১২৬৪ সালের ১লা চৈত্রে গ্রন্থকর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর "হিত-প্রভাকর" নামধেয় আর একখানি গদ্য পদ্যময় গ্রন্থ রচিত হয়। কথিত আছে, গুপ্ত মহাশয় সুবিখ্যাত বেথুন সাহেবের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া বিষ্ণুশর্ম্মাকৃত হিতোপদেশের

মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ,ও সন্ধি এই চারিটী বিষয় অবলম্বন করত ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার রচনাপ্রণালী সরল; দুর্ব্বোধ স্থান প্রায়ই নয়নগোচর হয় না। ঐ গ্রন্থ তাঁহার মৃত্যুর পর ১২৬৭ সালের ১১ই চৈত্রে তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্ত (যিনি বর্ত্তমান প্রভাকর সম্পাদক) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন "বোধেন্দুবিকাশ" ও "কলিনাটক"নামধেয় দুই-খানি গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করিয়াই জীব-লীলা সম্বরণ করেন। ১২৭২ সালে প্রথমোক্ত পুস্তক-খানির তিন অঙ্ক মাত্র প্রচারিত হয়। তাহা প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকের আভাস লইয়া রচিত। তাহার অধিকাংশ স্থানই হাস্যরসে পরিপূর্ণ। গুপ্ত মহাশয় হাস্যরস বর্ণনায় বিশেষ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কতশত হাস্যোদ্দীপক সঙ্গীত ও নানা বিষয়িণী কবিতা-মালা রচনা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘে তিনি এই সকল অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করত, ইহলোক পরিত্যাগ

করেন। কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের সমকালেই এতদ্দেশীয় গায়কসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে দাশরথী রায় বিশেষ খ্যাতি-লাভ করেন। অথচ তিনি ভালরূপ লেখা পড়া জানিতেন না। সঙ্গীত রচনাই তাঁহার প্রধান উপজীবিকা ছিল। দাশরথী প্রণীত পাঁচখণ্ড পাঁচালি এখন বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়া বিক্রীত হইতেছে।

১৭৪৯ শকে (১৮২৭ খৃঃ অব্দে) মুলাযোড় নিবাসী বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নদামঙ্গলের বিষয় লইয়া দুর্গামঙ্গল রচনা করেন। কথিত আছে, কলিকাতা নিবাসী সুবিখ্যাত মৃত বাবু আশুতোষ দেবের উৎসাহে উক্ত কাব্যখানি রচিত হইয়াছে। তাহাতে প্রশংসনীয় ভাগ অতি অল্প।

প্রায় ২০ বৎসর অতীত হইল, রঘুনন্দন গোস্বামী নামক জনৈক ব্যক্তি রামায়ণের সপ্ত কাণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক "রামরসায়ন" নামক কাব্য রচনা করেন। সেই গ্রন্থের রচনাপ্রণালী

বড় উৎকৃষ্ট নহে, কিন্তু তাহাতে রচয়িতার কবিত্বশক্তি পরিচায়ক অনেক স্থল দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকর্ত্তা অতি উত্তমরূপ সংস্কৃত জানিতেন।

এইরূপ কত শত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন; কত শত মহোদয়ের মনোদ্যানোৎপন্ন পুষ্পসমূহ বিক্রয় করিয়া কত শত লোক জীবন ধারণ করিতেছে; কত শত ব্যক্তি তাঁহাদিগের রচনাবলী পাঠ করিয়া বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন; কত শত মহোদয় তাঁহাদিগের রচনাপ্রণালী অবলম্বন, কেহ বা আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া উৎসাহিত মনে, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাব্য সকল রচনা করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যে মহোদয়দিগের লেখনীবলে, এতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাঁহারাই ধন্য। তাঁহাদিগের যশই প্রকৃত ও চিরস্থায়ী। যত দিন বঙ্গভাষা জগন্মণ্ডলে বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন একজনও স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তি জীবিত থাকিবেন, ততদিন

ভারতচন্দ্রাদি কবিকুলের কখনই অনাদর হইবে না। যতই বিদ্যার উন্নতি হইবে, যতই দেশীয়-গণ সভ্যতার উচ্চাসনে স্থান পাইবেন, বঙ্গীয় প্রাচীন রচয়িতৃগণের যশোকান্তি ততই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

এস্থলে শ্রীরামপুরস্থ মিসনরিগণ ও কলি-কাতাস্থ স্কুল বুক সোসাইটী, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার বিষয়ও নিতান্ত নিস্ফলে কথিত হইবে না। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে একদল প্রোটেষ্টাণ্ট মিসনরি এতদ্দেশে আগমন করিয়া শ্রীরামপুরে অবস্থিতি করেন। ডাক্তার মার্স-মান ও মাষ্টার ওয়ার্ড তাঁহাদিগের প্রধান নায়ক ছিলেন। মহা মান্য কেরি উহাঁদিগের প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আগমন করত মালদহ জেলায় বাস করেন। এই সময়ে তিনি শ্রীরামপুরস্থ মিসনরিদিগের সহিত মিলিত হন। যদিও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করা এই মহোদয়-দিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাচ তাঁহারা এই দেশ-বাসিগণের অবস্থা ও ভাষার উন্নতি সাধনে বিশেষ

যত্নবান ছিলেন। তাঁহাদিগের যত্ন ও অধ্যবসায় বলে শ্রীরামপুরে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। তাহাতে রামায়ণ, মহাভারত, ও অভিধান প্রভৃতি অনেক বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষায় ইংরাজি প্রণালীতে অভিধান রচনা করা, কেরি সাহেব কর্ত্তৃক প্রথম উদ্ভাবিত হয়। তাঁহার প্রণীত অভিধান এখন অস্মদ্দেশে প্রচারিত রহিয়াছে। তিনি একোনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে "খৃষ্ট ধর্ম্ম শুভ সংবাদ বাহক" নামে একখানি পুস্তক প্রথম মুদ্রাঙ্কন করেন। ১৮০১ খৃঃ অব্দে "নিউটেষ্টমেণ্ট" নামক গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া এই গ্রন্থ প্রথম লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা "খৃষ্টধর্ম্ম শুভ সংবাদবাহক"নামক পুস্তকের কিছুকাল পরে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার উৎসাহে বাবু রামরাম বসু কর্ত্তৃক "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" নামক একখানি গদ্য গ্রন্থ রচিত হয়। বাবু রামরাম বসু কলি-

কাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের এক জন শিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রতাপাদিত্যের বংশো- দ্ভব। বিজ্ঞান ও সাহিত্য শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল, কিন্তু তল্লিখিত গ্রন্থের রচনা অত্যন্ত জঘন্য। সেই পুস্তক তৎকালে বিদ্যালয়- সমূহের প্রধান পাঠ্য পুস্তক ছিল। সাধারণের দর্শনার্থ উক্ত গ্রন্থের কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"ইহা ছাড়াইলে পুরির আরম্ভ। পূবে সিংহদ্বার পুরির তিনভিতে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সারিসারি লম্বা তিন দালান তাহাতে পশুগণের রহিবার স্থল। উত্তর দালানে সমস্ত দুগ্ধবতী গাভীগণ থাকে দক্ষিণ ভাগে ঘোড়া ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও উঠ তাহাদের সাতে সাতে আর আর অনেক অনেক পশুগণ।

এক পোয়া দীর্ঘ প্রস্থ নিজপূরী। তার চারিদিগে প্রস্তরে রচিত দেয়াল। পূবেরদিগে সিংহদ্বার তাহার বাহির ভাগে পেট কাটা দরজা। শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ আমারি সহিৎ হস্তি বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর এক স্থান তাহার নাম নওবৎ-খানা তাহাতে অনেক অনেক প্রকার জন্ত্র দিবা রাত্রি সময়ানু- ক্রমে জন্ত্রিরা বাদ্যধ্বনি করে।"

তৎপরে কেরি সাহেব স্বয়ং বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও কথাবলি নামক দুইখানি পুস্তক প্রচার করেন।

১৮০৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার দ্বারা মহানগরী কলিকাতায় কৃষি-বিদ্যা সমালোচক নামক একটী সমাজ স্থাপিত হয়। ইহার দ্বারা বঙ্গদেশের অনেক উপকার হইয়াছে। পূর্ব্বে এই সভা হইতে বঙ্গভাষায় একখানি পত্রিকা প্রচারিত হইত।

অতঃপর কেরির জ্যেষ্ট পুত্র ফিলিপ্ কেরি "বৃটিস দেশের বিবরণ" নানক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে কয়েক জন ইংরাজ ও দেশীয় মহোদয় দ্বারা স্কুলবুক সোসাইটী নাম্নী সভা স্থাপিত হয়। অল্প মূল্যে উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রচার করাই উক্ত সভার উদ্দেশ্য। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে বর্ণাকিউলার লিটারেচর সোসাইটী অর্থাৎ বঙ্গীয় স হিত্য সভা ইহার সহিত সংযোজিত হয়। উক্ত সোসাইটীর দ্বারা উৎসাহিত হইয়া

কত শত মহোদয় কত শত গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। উক্ত সভা দ্বারা প্রকাশিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" ও "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রদ্বয় অতীব প্রশংসনীয়। ইহা হইতে বঙ্গদেশের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে।

১৭৬১ শকের (১৮৪০ খৃঃ অব্দ) ২১এ আশ্বিন অশেষ গুণালঙ্কৃত পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা ও তাঁহার বন্ধুবর্গ একত্রিত হইয়া বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহোদয়ের ভবনে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত করেন। বঙ্গসাহিত্যের গদ্য রচনার উন্নতি এই সভা হইতেই সাধিত হইয়াছে। তত্ত্ববোধিনী সভার পত্রিকাখানি বঙ্গ সাহিত্যের কোষ স্বরূপ বলিলেও বলা যায়। ইহাতে যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, বোধ হয়, বঙ্গীয় সমাজের প্রচলিত কোন পত্রিকায় সেরূপ উন্নতি সাধক বিষয় প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে কঠোপনিষদ্ নামক গ্রন্থ প্রথম তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক প্রচারিত

হইয়াছিল। তৎপরে বেদান্তসার, ব্রাহ্মধর্ম্ম, পঞ্চদশী প্রভৃতি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক এই সভা কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে,তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে উক্ত সভার কোন প্রকৃত বন্ধু উহার উন্নতির নিমিত্ত একটী মুদ্রা-যন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। সভার ব্যয় সাধা-রণ চাঁদা হইতে সমাধা হইত। মৃত বাবু দ্বারকা-নাথ ঠাকুর এই সভার অনেক উপকার করিয়া-ছিলেন। তিনি ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে সভার ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ জন্য ৩,৪২৫ টাকা প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আর আর অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। পরিশেষে মহোদয় এন্. হল-হেড; সর চারলস্ উইলকিন্স; এবং মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় কিছু না বলিয়া উপস্থিত বিষয়ের উপসংহার করিলে, প্রস্তাব অসম্পূর্ণ বোধ হয়। এজন্য তাঁহাদিগের বিব-রণ ক্রমে লিখিত হইতেছে।

এন, হলহেড মহোদয় ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে সিবিলিয়ান হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন।

তিনি নিজ মেধাশক্তি প্রভাবে এতদ্দেশীয় ভাষাসমূহে এতদূর ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ইউরোপীয় তত পরিমাণে এদেশীয় ভাষায় জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে যখন রাজ-কার্য্যের ভার ইউরোপীয় কর্ম্মচারিবর্গের হস্তে অর্পিত হয়, তখন তৎকালিক গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সেই সকল কর্ম্মচারীকে এতদ্দেশীয় প্রণালী অবলম্বন দ্বারা রাজ-কার্য্য সম্পন্ন করাইবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তজ্জন্যই তিনি হলহেড সাহেবকে হিন্দু ও মুসলমান আইন সমূহ অনুবাদ করিতে আজ্ঞা দেন। হলহেড সাহেব তদনুযায়ী দেশীয় প্রাচীন আইন সকল অনুবাদ করিয়া এক-খানি ইংরাজী পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহা ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। তিনি বঙ্গ ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তৎ কর্ত্তৃক একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থিতও প্রচারিত হয়। ইহার পূর্ব্বে

কোন বাঙ্গালা পুস্তক যন্ত্রারূঢ় হয় নাই। সেই গ্রন্থ প্রথমতঃ হুগলিতে যন্ত্রিত হইয়াছিল। মহোদয় হলহেড সাহেবের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় কোন ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল কি না, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। সুতরাং তাঁহাকেই বঙ্গভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অবশ্যস্মরণীয় চারল্‌র্স উইলকিন্স মহাশয়, হলহেড সাহেবের একজন বন্ধু ছিলেন। তাঁহারও বঙ্গ ভাষায় বিশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি অতি উৎকৃষ্ট শিল্পী ছিলেন। তাঁহার গুরুতর পরিশ্রম ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে বঙ্গভাষায় খোদিত অক্ষর প্রথম ঢালাই হয়। যদিও সেই সকল বর্ণমালা সুছাঁদ রূপে খোদিত হয় নাই বটে, তথাচ সেই অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন সময়ে, কেবল মাত্র নিজ বুদ্ধি ও শারীরিক পরিশ্রম সহায়ে যে তিনি এক সাট অক্ষর প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার পরোপকারিতা ও মহানুভাবিতা গুণের পরিচয় দিতেছে। এবং তজ্জন্য তিনি শত

শত ধন্যবাদের পাত্র। অজ্ঞানান্ধকারাবৃত কোন বিদেশে যাইয়া তদ্দেশের ভাষা শিক্ষা, সেই সকল ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা, ও তদুন্নতি সাধক যন্ত্র সকল নির্ম্মাণ করা সামান্য ক্ষমতা, অধ্যবসায় ও অস্বার্থপরতার আয়ত্তাধীন নহে, যদি উইলকিন্স সাহেব কষ্ট স্বীকার করিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় অক্ষর প্রস্তুত না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, হলহেড সাহেবের ব্যাকরণ জনসমাজের কোন উপকারেই আসিত না। সাধারণের অজ্ঞানতাবস্থাতেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। উইলকিন্স সাহেবের যত্ন ও পরিশ্রমে তদীয় বন্ধু হলহেড মহাশয়ের গ্রন্থ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে মুদ্রিত হইয়াছিল।

মহামান্য রাজা রামমোহন রায়ের স্বদেশপ্রিয়তা ও বিদ্যানুরাগিতার বিষয় অস্মদ্দেশীয় জনগণের কাহারও অবিদিত নাই। তিনি স্বদেশের উন্নতি জন্য যে কি পর্য্যন্ত কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ করা যায় না। তিনি স্বদেশের উন্নতি করিতে করিতে

অনাথিনী বঙ্গ-ভাষাকেও বিস্মৃত হন নাই। তৎপ্রণীত ব্যাকরণ, বক্তৃতা, ও সঙ্গীত মালা বঙ্গভাষার অঙ্গশোভিনী হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত গুণের কখনই অনাদর নাই।

এইরূপ কত শত মহাত্মা বঙ্গভাষার উন্নতি লক্ষ্য করিয়া কত শত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; এইরূপ কত শত মহাশয় সঙ্গীত-সুধা অক্লেশে উত্তোলন করত সাধারণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন; এইরূপ কত শত মহোদয় ভাষা-উদ্যানে বাস করত, সুরস-ফল প্রদ কাব্য-বৃক্ষ সকল সাধারণের জন্য রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। চিরদুঃখিনী বঙ্গভাষার ভাগ্যে কখনই অনুকূল-বৃষ্টি বর্ষিত হয় নাই। সর্ব্বদাই দুরদৃষ্ট রবির প্রখর কিরণে ইহার সাহিত্য-ক্ষেত্র সম্ভূত অঙ্কুর সকল অকালে অধিকাংশই ধ্বংসিত হইয়াছে। তবে কতকগুলি সদাশয় মহোদয়ের যত্নে, অবশিষ্টাংশ যাহা ছিল, তাহাই যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইয়াছে। এমন কি, কেহ কেহ শারীরিক

পরিশ্রম ও কেহ বা বহুল অর্থ ব্যয় করত, রোপণকারীদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইহা কি সামান্য মহানুভাবতা যে, এক ব্যক্তি স্বার্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল সাধারণের উপকারার্থ ভূমির উর্ব্বরতা সাধন পূর্ব্বক তৎসম্ভূত উপস্বত্ব সাধারণকেই প্রদান করিয়াছেন। ধন্য বদান্যতা! এরূপ মহাত্মা পৃথিবীর সকল স্থানে, সকল সময়ে বর্ত্তমান থাকিলে জগতের বিশেষ মঙ্গল সম্ভাবনা।

(বঙ্গভাষার বিদ্যালয়।)

স্বদেশের ভাষা অনুশীলন ব্যতিরেকে লোকে কখনই শীঘ্র ও সহসা আত্মোন্নতি করিতে পারে না। এক ব্যক্তি বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া কত শত রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক যে বিদেশীয় ভাষা মধ্যমরূপ শিক্ষা করিবেন, তাঁহার ন্যায় মেধা-শক্তি সম্পন্ন অপর এক ব্যক্তি তদপেক্ষা অল্প ব্যয় ও অল্প পরিশ্রমে স্বকীয়

ভাষায় মহাপণ্ডিত মধ্যে গণ্য হইতে পারেন। এক ব্যক্তির বিদেশীয় ভাষা বহুকাল শিক্ষা করিয়া এক পংক্তি রচনা করিতে হইলে, বারম্বার অভিধান ও ব্যাকরণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু অপর এক ব্যক্তি স্বদেশীয় ভাষায় তাঁহা অপেক্ষা অল্প ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ সুললিত কাব্য সমূহ রচনা করিতেছেন। দেশীয় লোক স্বদেশের ভাষা যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা না করিলে কখনই দেশের ভাষায় উত্তমোত্তম গ্রন্থের সৃষ্টি হয় না। অস্মদ্দেশীয়দিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী ভাষায় কাব্যাদি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু কেহই ইংরাজ জাতিকে পরাজিত করিতে সক্ষম হন নাই। কোন্ স্থলে কিরূপ শব্দ প্রয়োগ করা উচিত, দেশীয় লোক যেমন সেটী বুঝিবেন, বিদেশীয়েরা কখনই ততদূর পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবেন না। দেখুন! যখন ইংলণ্ড দেশে নর্ম্মাণ ফ্রেঞ্চ ভাষা প্রচলিত ছিল, তখন ঐ দেশে কোন সুবিখ্যাত কবি আবি-

ভূ্ত হন নাই, কিন্তু যখন ইংলণ্ডে দেশীয় ভাষার আলোচনা বৃদ্ধি হইল, অমনি উন্নত-মানসিক-বৃত্তি-সম্পন্ন সেক্সপিয়র, মিল্টন, বায়রণ প্রভৃতি কবি-কূল-চূড়া ব্যক্তিগণ জনসমাজে কীর্ত্তিলাভ করিলেন; যখন জর্ম্মণদেশ হইতে ফ্রেঞ্চ ভাষা অন্তর্হিত হইল, তখন অমনিসুবিখ্যাত গোয়েথি, সিলর, ফ্রিনিগ্রথ্ প্রভৃতি মহোদয়গণের চিত্তোদ্যান জর্ম্মণীয় কবিত্ব-কুসুমে পরিপূর্ণ হইল। আসিয়া খণ্ডের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে দেখা যায়, যখন পারস্যদেশে আরব্য ভাষার অধিক আলোচনা হইত, তখন উক্ত দেশে কোন প্রসিদ্ধ কাব্য-প্রণেতা উদিত হন নাই, কিন্তু যে সময়ে ঐ দেশে দেশীয় ভাষার আলোচনা বৃদ্ধি হইল, তখন ফেরদোসি ইরাণের রাজবৃত্তান্ত লইয়া বীররস-পরিপূর্ণা "সাহানামা" কাব্য প্রকাশ করিলেন, সাদিকৃত উপদেশময় গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইল, এবং ভুবন-বিখ্যাত কবিবর হাফেজও শান্তি-রসময়ী কবিতা-মালা প্রকাশ দ্বারা জন-সমাজে যশো-

ভাজন হইতে লাগিলেন। এক্ষণে সাধারণে দেখুন! স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা দ্বারা জগতের কতদূর মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। অতএব ব্যক্তি মাত্রেরই প্রথমতঃ স্বদেশীয় ভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়া তৎপরে বিদেশীয় ভাষানুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে, কিপ্রকারে দেশীয় ভাষার অনুশীলন বহুলরূপে হইতে পারে। অল্পবুদ্ধির প্রভাবে এই মাত্র বলা যায় যে, বিদ্যামন্দির সংস্থাপনই তাহার প্রশস্ত উপায়। বিদ্যালয় সংস্থাপন পদ্ধতি সকল সভ্য-জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশেও এই প্রথা বহুকালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তাহারই বিবরণ বর্ণন করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। কিন্তু বঙ্গ-দেশের ইতিবৃত্ত এতদূর অপরিজ্ঞেয় যে, প্রাচীনকালের কোন বিবরণই বিশিষ্টরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় না। বঙ্গভাষার বিদ্যালয় সম্বন্ধে অধুনা যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহারই সার মর্ম্ম এস্থলে লিখিত হইল। যথাঃ—

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মালদহ প্রদেশে ইলর্টন সাহেব কর্ত্তৃক, এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানার্থ, কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মান্যবর ইলর্টন সাহেব বঙ্গদেশের এক জন মহোপকারী ব্যক্তি। তৎকালে তাঁহার যত্নে বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকের অনেক অভাব মোচন হইয়াছিল। তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে মহামান্য গবর্ণর জেনেরল লর্ড ওয়েলেস্লি ভাবিলেন, ইংলণ্ড হইতে যে সকল সিবিল-সার্বেণ্ট ভারতবর্ষে আগমন করিতেন, তাঁহারা কেহই এতদ্দেশীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। তন্নিমিত্ত রাজকার্য্যের অত্যন্ত গোলযোগ হইত। লর্ড ওয়েলেসলি সেই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত তিনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে "ফোর্টউইলিম কালেজ নামক" একটী বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন। তাহাতে কেবল এতদ্দেশীয় ভাষা সমূহ শিক্ষা প্রদান করা হইত। ইংলণ্ড হইতে যে সকল ব্যক্তি সিবিলিয়ান হইয়া এখানে আসিতেন, তাঁহারা উপরি

উক্ত বিদ্যালয়টীতে অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ না হইলে সর্বিসে প্রবেশের অনুমতি পাইতেন না। পূর্ব্ব কথিত ডাক্তার কেরি সেই বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের আসন প্রাপ্ত হয়েন। এতদ্ভিন্ন উৎকল নিবাসী পণ্ডিতবর মৃত্যুঞ্জয় ও অন্যান্য অনেক উপযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়েরা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ বঙ্গভাষায় অনেকগুলি পুস্তক রচিত ও মুদ্রাঙ্কিত হয়। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে পাদরি মে সাহেব চুচুঁড়া নগরীতে একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৫ খৃঃ অব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত তৎ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের-সংখ্যা ১৬টী হইয়াছিল। সেই সকল বিদ্যালয়ে ৯৫১ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তাহার পর বিদ্যালয়-সংখ্যা ২৬টী হইলে, বদান্যবর গবর্ণর জেনেরেল লর্ড হেষ্টিংস কর্ত্তৃক উপরোক্ত বিদ্যা-মন্দির সমূহের উন্নতি নিমিত্ত সাহায্য প্রদত্ত হয়। ১৮১৬ খৃঃঅব্দে পূর্ব্ব কথিত বিদ্যালয় সমূহে ২,১৩৬জন বালক

পাঠ করিত। এইরূপে ক্রমশঃ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়াতে অধিক শিক্ষকের প্রয়োজন হইতে লাগিল, তজ্জন্য শিক্ষক প্রস্তুত করণার্থ আর একটী স্বতন্ত্র বিদ্যামন্দির সংস্থাপিত হয়। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭টী হইয়াছিল। তাহাতে ৩০০০ ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। কিন্তু বঙ্গদেশের হতভাগ্যতা দোষে এই সময়ে রেবরেণ্ড মে সাহেব প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার পর পিয়ার্সন সাহেব উক্ত বিদ্যালয় সমূহের ভার গ্রহণ করেন। সদাশয় পিয়ার্সন এবং হার্লি এ দেশের উন্নতির জন্য বিস্তর কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই দুই পাদরির প্রযত্নে চন্দননগর ও কালনার মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহে অনেকগুলি বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। ১৮১৯ খৃঃঅব্দে উক্ত মহোদয়দিগের হস্তে চুচুঁড়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ১৭টী বিদ্যালয় ও ১৫০০ ছাত্র এবং বাঁকিপুরে ১২টী স্কুল ও ১২৬৬ জন বালক

ছিল। সেই সকল স্কুলে মান্দ্রাজের শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে শিক্ষা প্রদত্ত হইত। সেই বিদ্যালয় সকলের উন্নতির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৮০০ টাকা সাহায্য প্রদান করিতেন।

চর্চ মিসন সোসাইটীও বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই সভাকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া বর্দ্ধমানে দুটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৮১৮ খৃঃঅব্দে তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০টী হয়, তাহাতে ১০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ষ্টুয়ার্ট সাহেব সেই সকল বিদ্যালয় স্থাপন সময়ে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন। বিশেষত সেই কালে তথায় ব্রাহ্মণ-শিক্ষকদিগের প্রতিষ্ঠিত ৫টী পাঠশালা ছিল। ব্রাহ্মণ শিক্ষক মহাশয়েরা লাভ ও ধর্ম্মলোপাশঙ্কায় মিসনরিদিগের বিপক্ষতাচরণ আরম্ভ করেন। কিন্তু যোগ্যবর ষ্টুয়ার্ট সাহেবের কার্য্য দক্ষতা-গুণে সেই সকল বিঘ্ন পরিশেষে নিবারিত হইয়াছিল। তিনি চুচুঁড়াস্থ মে সাহেবের

শিক্ষা প্রণালীর অনুকরণ করেন। সেই সকল পাঠশালায় মাসিক ২৪০ টাকা ব্যয় হইত।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী" কতকগুলি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। তাহাতে বর্দ্ধমানস্থ ষ্টুয়ার্ট সাহেব প্রণীত নিয়মাদি প্রচলিত হইয়াছিল। সেই সকল বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটীর প্রতি ১৬ টাকা ব্যয় পড়িত। এই সময়ে এতদ্দে-শীয়গণও নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন না, তাঁহা-দিগের অধীনেও ১০০টী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হই-য়াছিল; এবং তাঁহারা সেই সকলের উন্নতির নিমিত্ত এতদূর যত্নবান হইয়াছিলেন যে, প্রথম বৎসরেই চাঁদা ও এক কালীন দান ৮০০০ টাকা সংগ্রহ করেন। মাননীয় ডেবিড হেয়ার সাহেবের পরোপকারিতার বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। তিনি নিজার্জ্জিত তাবৎ সম্পত্তি ও জীবনের অধিকাংশই এ দেশের মঙ্গলজন্য ক্ষেপণ করি-য়াছিলেন। তিনি মৃত রাজা সর রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সহায়তায় বঙ্গভাষার ও বঙ্গ বিদ্যা-

লয়ের উন্নতি বিধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারই প্রযত্নে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের গুরু-পাঠশালা সকল উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎকর্ত্তৃক অনেক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। তন্মধ্যে "সেণ্টারল বর্ণাকিউলার স্কুল" নামক বিদ্যালয়টী প্রধান। এই পাঠশালায় দুই শত বালক অধ্যয়ন করিত।

১৮২১ খৃঃ অব্দে ১১৫টী বাঙ্গালা বিদ্যালয় ছিল। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ সকল বিদ্যালয়ের কার্য্য অতি উৎকৃষ্টরূপে চলিয়া আইসে। ঐ সকল বিদ্যালয ১৮২৩ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট হইতে ৫০০ টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন ঐ সকলে ৩,৮২৮ জন ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইত।

কলিকাতাস্থ চর্চ্চমিসনরি এসোসিয়েসন দেশীয় ভাষার অনেকগুলি বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সকল পাঠশালায় ছাত্র সংখ্যা ছয় শতের অধিক ছিল না। এই সময়ে বাপ্টিষ্ট মিসনরি সোসাইটী এবং লণ্ডন মিসনরি

সোসাইটী দ্বারায়ও অনেকগুলি বাঙ্গালা পাঠ-শালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৮২১ খৃঃ অব্দে চর্চ্চসোসাইটী কলিকাতাস্থ স্কুল বুক সোসাইটীর নিকট হইতে কতকগুলি বিদ্যালয়ের ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সেই সকলের তত্ত্বাবধানার্থ জোঠার সাহেবেকে নিযুক্ত করেন। ১৮২২ খৃঃ অব্দে একখানি পুস্তকে যীশুখৃষ্টের নাম দর্শন করত অকস্মাৎ কতকগুলি বালক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছিল।

মিস কুক নাম্নী একটী ইউরোপীয় স্ত্রীলোক ১৮২১ খৃঃ অব্দে মাননীয়া লেডী হেষ্টিংসের উৎসাহে চর্চ্চ মিসনরি সোসাইটীর সহিত সংস্রব রাখিয়া কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম সূত্রপাত করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তৎ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২টী হয়। তাহাতে ৪০০ বালিকা অধ্যয়ন করিত।

"খৃষ্টান নলেজ সোসাইটী" ১৮২২ অব্দে প্রথম সার্কেল স্কুল সংস্থাপন করেন। তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক সার্কেলে ৫টী করিয়া বঙ্গ-

পাঠশালা ও একটী সেণ্ট্রাল স্কুল ছিল। পূর্ব্বে যে সকল সার্কেল ছিল, তন্মধ্যে টালিগঞ্জ, হাবড়া, ও কাশীপুর অতি প্রধান। ১৮৩৪ অব্দে প্রপোগেসন সোসাইটী ঐ সকল বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। তাহাতে ৬৯৭ জন বালক অধ্যয়ন করিত। ১৮২৪ খৃঃ অব্দে "সেণ্ট্রাল স্কুল" এবং ১৮৩৭ অব্দে "আগড়পাড়া অরফ্যান রেফিউজ" নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৎপরে সুবিখ্যাত ড্রিঙ্ক ওয়াটর বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। সেই সময়ে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয় দ্বিতীয় শিক্ষকের পদগ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় তৃতীয় শিক্ষক হন।

তৎপরে হুগলি ও ঢাকাস্থ নর্ম্মাল বিদ্যালয় প্রভৃতি অনেকগুলি দেশহিতকর বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ভিন্ন এক্ষণে বঙ্গদেশের নানা স্থানে কত শত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার নিশ্চয় করা অত্যন্ত সুকঠিন।

(বাঙ্গালা সংবাদ পত্র)

প্রায় ৫২ বৎসর অতীত হইল, বঙ্গদেশে বাঙ্গালা পত্রিকার প্রথম প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গদেশের শুভানুধ্যায়ী শ্রীরামপুরস্থ মিসনরিগণ ইহার প্রথম উদ্যোগী। ১৮১৮ খৃষ্টীয় অব্দের এপ্রেল মাসে পূর্ব্ব কথিত ডাক্তর মার্সমান সাহেব "দিগ্দর্শন" নামক একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। তাহাতে নানাবিধ হিতকর প্রবন্ধ ও সংবাদাদি লিখিত হইত, কিন্তু তাহা প্রথম সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াই "সমাচার দর্পণ" নাম ধারণ করত সাপ্তাহিক নিয়মে প্রচার আরম্ভ হয়। ডাক্তার কেরি সাহেব এই পত্র প্রচারণ

বিষয়ে অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আপত্তি কোন ফলদায়ক হয় নাই। গবর্ণর জেনেরল লর্ড হেষ্টিংসও মিসনরিদিগের এই মহৎ কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, ইহার উন্নতির নিমিত্ত তৎকালপ্রচলিত ডাক মাশুলের চতুর্থাংশে ইহা বিতরণের অনুমতি দেন। হৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর সমাচার দর্পণের প্রথম গ্রাহক শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হন, তৎপরে অন্যান্য স্বদেশপ্রিয় মহোদয়গণ তাহার উন্নতিকল্পে ব্রতী হইয়াছিলেন। সমাচার দর্পণ প্রকাশের এক পক্ষ পরে "তিমির নাশক" নামক একখানি সংবাদ পত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। একজন বঙ্গবাসী ইহার সম্পাদক ছিলেন। বাঙ্গালী কর্ত্তৃক এই প্রথম সংবাদ পত্র প্রচার হয়। দুঃখের বিষয়, তিমির নাশক স্বকীয় নামের সার্থকতা সাধন করিবার পূর্ব্বেই বঙ্গসমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল!

উহার কিয়দ্দিন পরে প্রাচীনতম "সমাচার চন্দ্রিকা" কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। হৃত

বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সময়ে সময়ে সমাচার দর্পণ ও চন্দ্রিকায় তুমুল সংগ্রাম হইত।—যখন গবর্ণমেণ্ট সহমরণ প্রথা নিবারণ জন্য সচেষ্ট হয়েন, তখন সেই বিষয় লইয়া পূর্ব্বোক্ত পত্রদ্বয়ে অত্যন্ত আন্দোলন হইয়াছিল। সমাচার দর্পণ উক্ত দুর্নীতি সংশোধন জন্য অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রিকায় বিপরীত মত ব্যক্ত হয়। চন্দ্রিকা হিন্দু-সমাজের প্রতিপোষিকা ছিলেন। খৃষ্টানদিগের অযথা আক্রমণ হইতে হিন্দু ধর্ম্মকে রক্ষা করণার্থ এই পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছিল। রাজা সর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও অন্যান্য হিন্দুধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ চন্দ্রিকার অনেক উপকার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, দর্পণ ও চন্দ্রিকা প্রায় ক্রমাগত দশ বৎসর প্রতিযোগিতা করিয়াছিল। তদনন্তর প্রথমোক্তখানি জনসমাজ পরিত্যাগ করে, শেষোক্ত চন্দ্রিকা এখনো যথানিয়মে বহির্গত হইয়া স্বদেশের উপকার সাধন করিতেছে।

গ্রন্থকর্ত্তাদিগের বিবরণ লিখিবার সময়ে কথিত হইয়াছে, ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ হইতে "সংবাদ প্রভাকর" পত্রের প্রচার আরম্ভ হয়। কলিকাতাস্থ মৃত মহাত্মা যোগীন্দ্র মোহন ঠাকুর এই পত্র প্রচারণের বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ সাপ্তাহিক নিয়মে চলিত, ১২৪৩ সালের ২৭এ শ্রাবণ বুধবার হইতে তিন বৎসর কাল সপ্তাহে তিনবার করিয়া মুদ্রিত হয়, ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যথা নিয়মে প্রত্যহ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত ইহার বর্ত্তমান সম্পাদক। মান্যবর বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহকারিতা করিয়া থাকেন। প্রভাকরের পর সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্র প্রকাশিত হয়।

১২৪২ সালে "সংবাদ ভস্কার" পত্র প্রথম উদয় হয়। মৃত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পত্রের জন্মদাতা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় খর্ব্বাকার ছিলেন, এ জন্য তাঁহাকে সকলে

"গুড়্ গুড়ে ভট্টাচার্য্য" বলিয়া ডাকিত। তিনি সুলেখেক ছিলেন, তাঁহার গদ্যপদ্য উভয়বিধ রচনা করিবার ক্ষমতা ছিল। তাঁহার দ্বারা অনেকগুলি বিলুপ্ত পুস্তক আবিষ্কৃত ও অনুবাদিত হইয়াছে। তিনি পরলোক গত হইলে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় নানা বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করত ভাস্করকে জীবিত রাখিয়াছেন।

১৭৬৫ শকে (১২৫০ সালে) তত্ত্ববোধিনী সভার পত্রিকা প্রকাশ হইয়াছিল। এই পত্রিকা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই এক প্রকার কথিত হইয়াছে, অতএব এস্থলে তাহা পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই। অনন্তর "সাধুরঞ্জন" ও "পাষণ্ড পীড়ন" নামক দুই খানি সাপ্তাহিক পত্র প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বর বাবু দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। "পাষণ্ড পীড়ন" ১২৫৩ সালের ৭ই আষাঢ় দিবসে প্রথম মুদ্রিত হয়। সীতানাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি তাহার নামধারী সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু কবিবর ঈশ্বর গুপ্তই তাহার সমুদায় কার্য্য করি-

তেন। পূর্ব্বোক্ত পত্রদ্বয় প্রথমতঃ নানা প্রকার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধদ্বারা অলঙ্কৃত করা হইত, কিন্তু কিছুকাল পরে ভাস্কর সম্পাদক গৌরী শঙ্কর ভট্টাচার্য্য “রসরাজ” পত্র প্রচার করেন। এক ব্যাবসয়ী লোকেরা কখনই মিলিতভাবে থাকিতে পারে না। সুতরাং কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত ভাস্কর সম্পাদকের প্রতিপক্ষ হইয়া উঠি-লেন। তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে পরস্পরের কুৎসা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে নামধারী সম্পাদক সীতানাথ ঘোষ পাষণ্ড পীড়নের শীর্ষক পংক্তি গো-পনে লইয়া পলায়ন করেন। তাহার পর ভাস্কর যন্ত্রালয় হইতে দুই এক সংখ্যা বা-হির হইয়াই লুক্কায়িত হয়। রসরাজ জীবিত থাকিয়া আর কিছুকাল উৎপাত করিয়াছিল। তাহার সমকালে “যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল” নামক একখানি পত্রের প্রচার হয়। সংস্কৃত কালেজের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র তাহা সম্পাদন করিতেন। এই পত্রের সহিতও

রসরাজের কলহ হইয়াছিল। সেই বিবাদ উপলক্ষে যেমন কর্ম্ম তেমনি ফলের মৃত্যু হয়, রসরাজ তাহার পরেও মুদ্রিত হইয়া আসিতে ছিল, কিন্তু ১২৭৫ সাল অবধি আর জনসমাজে বহির্গত হয় নাই।

ইহার পূর্ব্বে "সমাচার সুধাবর্ষণ" নামক পত্র প্রচারিত হয়।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে (১২৬১ সালে) বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা নাম্নী পত্রিকার প্রচারণ আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ ইহা নানা প্রকার উন্নতি সাধক প্রবন্ধ সমূহে পরিপূরিত হইয়া, মাসিক নিয়মে প্রকাশিত হইত। শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র আঢ্য মহাশয় ইহার সম্পাদক। সম্পাদক গুরুতর পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করতঃ, এক্ষণে এই পত্রিকা খানি প্রাত্যহিক রূপে প্রকাশ করিতেছেন।

১২৬৩ সালে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা-বিভাগের নিমিত্ত "এডুকেশন গেজেট" নামক একখানি বাঙ্গালা-পত্র প্রকাশেচ্ছুক হন। পাদরি স্মিথ সাহেবের প্রতি এই পত্র সম্পাদনের ভার অর্পিত

হয়। প্রথমে কলিকাতার দক্ষিণাংশ পদ্মপুকুর নামক স্থান হইতে প্রকাশিত হইত। তৎপরে বাবু প্যারীচরণ সরকার মহোদয় সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে এডুকেশনের অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল, তিনি ইহার সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে উহার সমস্ত ভার মান্যবর ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এডুকেশন গেজেট হুগলি বুধোদয় যন্ত্র হইতে যন্ত্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৩০০ টাকা সাহায্য প্রদান করিতেন, ভূদেব বাবুর সময়ে তাহা রহিত করিয়াছেন।

১২৬৪ সালে দেশহিতৈষী বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় দ্বারা বর্ণাকিউলার লিটারেচর সোসাইটীর সহায্যে "বিবিধার্থসংগ্রহ" প্রচারিত হয়। সেই পত্র প্রতি মাসে মুদ্রিত হইত। স্বত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ও কিছুকাল তাহা সম্পাদন করিয়া ছিলেন। বিবিধার্থ-

সংগ্রহ এক্ষণে জীবিত নাই; তাহার পরিবর্ত্তে "রহস্য-সন্দর্ভ" প্রকাশিত হইতেছে।

১২৬৫ সালে "সোমপ্রকাশ" প্রচারিত হয়। প্রথমতঃ ইহা কলিকাতায় মুদ্রিত হইত। কিন্তু এক্ষণে উহা কলিকাতার দক্ষিণ চাঙ্গড়ি-পোতা নামক স্থান হইতে সাপ্তাহিক নিয়মে প্রকাশিত হইতেছে। সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য অধ্যাপক পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যা-ভুষণ ইহার সম্পাদক। বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় তাঁহার সহকারী। ইত্যগ্রে শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রায় দুই বৎসর কাল তাঁহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সংবাদ পত্রের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, সোম-প্রকাশে তাহার কিছুরই অভাব নাই; তজ্জন্যই বঙ্গসমাজে ইহার এত মান বৃদ্ধি হইয়াছে।

১২৬৭ সালের বৈশাখ হইতে "ভারত-বর্ষীয় সংবাদপত্র" নামক একখানি পত্র প্রকা-শিত হইয়াছিল। রত্নাবলী নাটকের মর্ম্মানুবাদক শ্রীযুক্ত তারকনাথ চূড়ামণি কর্ত্তৃক তাহা সম্পাদিত

হইত। কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তি এই উন্নতি-সাধক কার্য্যের নিমিত্ত ১৫৪৪ টাকা সাহায্য দান করিয়াছিলেন। সেই পত্র পক্ষান্তরে প্রকাশ হইত। দুঃখের বিষয়, বিনা মূল্যে বিতরণ জন্য সেই খানির সৃষ্টি হয়, সুতরাং অল্প দিন জীবিত থাকিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছে।

ঐ বৎসর "পরিদর্শক" পত্র প্রচার হয়। পণ্ডিতবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনগোপাল গোস্বামী ইহার প্রথম সৃষ্টি করেন। ১২৬৯ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে মৃত বাবু কালী-প্রসন্ন সিংহ মহোদয় উহার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে পরিদর্শক দীর্ঘ কলেবর ধারণ করে। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কা-লঙ্কার ও শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পত্রের সহকারী ছিলেন। ঐ বৎসর মধ্যে "সংবাদ সজ্জনরঞ্জন" ও "ঢাকা-প্রকাশ"নামক আর দুইখানি পত্রের সৃষ্টি হয়। প্রথমোক্ত পত্র অকালে অন্তর্হিত হইয়াছে, ঢাকাপ্রকাশ এখনও প্রতি সপ্তাহে বহির্গত হয়।

অতঃপর ১২৭১ সালে "হিন্দুহিতৈষিণী" পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বাবু হরিশ চন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন।

তৎপরে "গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা" "অমৃতবাজার পত্রিকা" "প্রয়াগদূত" "হিন্দুরঞ্জিকা" ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়া জনসমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। এতদ্ভিন্ন যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রিকা বঙ্গভাষার উন্নতি লক্ষ্য করত বাহির হইয়াছিল ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এক্ষণে অস্মদেশের অবস্থা উন্নত। আবাল বৃদ্ধ সকলেই স্বদেশ ও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। এই নিমিত্তই বাঙ্গালা পত্রিকার দিন দিন গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে। দেশীয় সংবাদপত্র যতই প্রকাশিত হইবে, ততই মঙ্গল।

পরিশেষে মহাত্মা প্রজাহিতৈষী গবর্ণর সর চার্‌ল্‌স্‌ মেট্‌কাফ্‌ সাহেবকে ধন্যবাদ না দিয়া প্রস্তাব শেষ করিতে পারিলাম না। তিনি ছয় মাস এই দেশ শাসন করিয়া অনেক উন্নতি-

সাধক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে এদেশীয় (কি ইংরাজী কি বাঙ্গালা) সংবাদপত্র সকল গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত কর্ম্মচারী দ্বারা পরীক্ষিত না হইলে, যন্ত্র হইতে বাহির হইত না। তন্নিবন্ধন পত্রিকা সম্পাদকদিগকে বিশেষ ক্ষতি সহ্য করিতে হইত, স্বাধীন মতও প্রকাশ করিতে পারিতেন না। সদাশয় মেট্‌কাফ্‌ সাহেব সেই গোলযোগ নিবারণের জন্য মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি অধিক কাল এদেশে থাকিলে অস্মদ্দেশের অত্যন্ত মঙ্গল হইত। তাঁহার নিমিত্ত এক্ষণে সকলে স্বাধীন ভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে, স্বদেশের কুরীতি সকল সংশোধনার্থ লেখনী ধারণ করিতেছেন; তাঁহারই মহানুভাবতায় অশিক্ষিত প্রজাগণ রক্ষা পাইতেছে; তাঁহা হইতেই দুষ্টমতি রাজকর্ম্মচারিগণের অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে। যে মহোদয় দ্বারা এতদুর উপকার সাধিত হইয়াছে, বঙ্গসমাজের কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

পরিশিষ্ট

যাঁহাদিগকে লইয়া বঙ্গভাষা, যাঁহারা বঙ্গভাষাকে ভাষামধ্যে গণ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, উপসংহারে তাঁহাদিগের বিষয় সমালোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক ও কৃতজ্ঞতার উপদেশ। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহা সাধ্যাতীত। তথাচ একবারে পরিত্যাগ করাও অবিধেয় বিবেচনায় যথা সাধ্য নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রহণ করিলাম।

এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার প্রথমেই পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগের বরণীয় হইতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামোচ্চারণ মাত্রেই আমাদিগের অন্তঃকরণ এক অপূর্ব্ব ভাবে আপ্লুত হয়। বস্তুতঃ তাঁহার করপল্লবনিঃসৃত বেতাল পঞ্চবিংশতি, বিধবাবিবাহ, সীতার বনবাস, শকুন্তলা, ভ্রান্তিবিলাস, জীবনচরিত, চরিতাবলী, বোধোদয় প্রভৃতি এবং সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, যিনি একবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি কখনই তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। উৎকৃষ্ট রচনা, উৎকৃষ্ট বিদ্যানুরাগ, সমাজসংস্করণ ও দানশীলতাদি বহুবিধ সদ্গুণ ইঁহার শোভাময় অলঙ্কার। এই

জন্যই তাঁহার যশঃপ্রভা দেশ বিদেশে বিস্তৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়। সুমধুর ও কোমল গদ্য রচনায় ইনি বিদ্যাসাগর অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। ইঁহার বর্ণিত বিষয় সকল অধিক শিক্ষাপ্রদ ও প্রীতিকর। ইনি কবিতাও রচনা করিতে পারেন। "অনঙ্গমোহন কাব্য" ইঁহার রচনা। পরিতাপের বিষয়! এই পুস্তকখানি অতিশয় অপ্রাপ্য হইয়াছে। অক্ষয়বাবুর অধিকাংশ প্রবন্ধ ইংরাজী হইতে অনুবাদিত, কিন্তু তাঁহার রচনার এমনি অপূর্ব্ব কৌশল যে, কিছুকাল পরে তাহাকেই মূল বলিয়া লোকের ভ্রম হইবে। ইনি "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রথম হইতে ১৭৭৭ শক পর্য্যন্ত সম্পাদন করিয়াছেন। এই পত্রিকা ও সংবাদ প্রভাকরে যে সকল প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, তাহাই সঙ্কলন করিয়া তিনভাগ চারুপাঠ, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার দুইভাগ, পদার্থ বিদ্যা, ধর্ম্মনীতি এবং ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় নামক ৮খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে ইঁহাকে বঙ্গভাষায় সুবিখ্যাত এডিসনের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক অক্ষয়বাবু এই তুলনার অযোগ্য পাত্র নন।

সগদ্গুণাধার বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বহুকাল হইতে বঙ্গভাষার রমণীয় উদ্যানে বিহার করিতেছেন।

স্বদেশহিতকর এমন অল্প বিষয়ই আছে, যাহাতে রাজেন্দ্রবাবু আহ্লাদের সহিত যোগ না দেন। বর্ণাকিউলার লিটারেচর সোসাইটীর ইনি একজন প্রধান অধ্যক্ষ। এই সভার "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। তাহার পরিবর্ত্তে "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্র লিখিত হইতেছে। উক্ত পত্রদ্বয়ের উৎকর্ষের বিষয় পূর্ব্বেই কহা হইয়াছে। ঐ দুই পত্রের বর্ণিত বিষয় কেবল বিজ্ঞবর রাজেন্দ্রবাবুর বহুদর্শিতা ও বিদ্যানুরাগিতার পরিচয় দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পত্রলিখিবার ধারা প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাবশ্যক পুস্তক, সুদৃশ্য মানচিত্র ও অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ফটোগ্রাফ্ সমূহ তাঁহার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। ইঁহার ন্যায় প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি বাঙ্গালী সমাজে দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি এই উদ্দেশে মধ্যে মধ্যে অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কেবল এই মাত্র গুণ নয়, এসিয়াটিক সোসাইটীর অধিবেশনে ইনি সচরাচর যে সকল দুর্লভ পদার্থের আবিষ্কারবিষয়িণী ঘোষণা পাঠ করেন, তাহা সাধারণের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও বিশেষ উপকারক। বিজ্ঞানশাস্ত্রের চর্চ্চায়ও ইঁহার আন্তরিক উৎসাহ ও অনুরাগ আছে। ৭।৮টী ভাষায় ইঁহার যথোচিত ব্যুৎপত্তি থাকাতে মনোগত সকল ইচ্ছাই প্রায় তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইতেছেন।

মৃত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় মাতৃভাষার বিশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মেধাশক্তি এত প্রখরা ছিল যে, তিনি সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সংস্কৃত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অনুবাদ করেন। মৃত কাশীরাম দেব যেমন মহাভারত পদ্যে লিখিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালীগণের সুবিধা করিয়াছেন, তেমনি সিংহ মহোদয় দ্বারা মূল মহাভারত অবিকল উৎকৃষ্ট গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদিত হওয়াতে সর্ব্বসাধারণের অধিকতর উপকার হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন বাবুর এই কার্য্য তাঁহার জীবনের দৃঢ়তর কীর্ত্তিস্তম্ভ। যে মহাভারত বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুর শত শত পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াও অদ্যাপি শেষ করিতে পারিলেন না, কালীবাবু ৮ বৎসরের মধ্যে সেই সুবিস্তৃত মহাভারত সম্পূর্ণ করিয়া সাধারণকে বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত সিংহ মহোদয় ভারত অনুবাদ করিয়াই যে নিশ্চিন্ত ছিলেন এমন নহে, "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" রচনা করিয়া বঙ্গ ভাষায় একপ্রকার নূতন রচনাপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার স্বরচিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে।

সুবিখ্যাত বাবু টেকচাঁদ ঠাকুর মহোদয়ের আলালের ঘরের দুলাল, রামারঞ্জিকা, যৎকিঞ্চিৎ, মদ খাওয়া বড় দায় ইত্যাদি পুস্তকও বঙ্গ ভাষার গৌরব স্বরূপ।

কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত বহুদিন হইল কবিযশো-মুকুট শিরে ধারণ করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই নিরর্থক শব্দালঙ্কার দ্বারা আপনাদিগের কাব্য পরিপূর্ণ করেন নাই। ভাবশক্তিতে মেঘনাদ ও পদ্মিনীর উপাখ্যান শ্রেষ্ঠ। শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মিনীর উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরীর রচয়িতা। প্রথমোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের নিমিত্ত তিনি বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছেন। মান্যবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয় বঙ্গভাষার অমিত্রাক্ষর ছন্দের "আদি পিতা" বলিয়া বিখ্যাত। ইনি ক্রমান্বয়ে শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া, মেঘনাদ বধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশ পদী কবিতাবলী নামক ১০খানি পুস্তক লিখিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ফ্রান্সরাজ্যের অন্তঃপাতী ভার্সেলিস নগর হইতে কলিকাতায় মুদ্রাঙ্কনার্থ প্রেরিত হয়। কবিবর ইটালিক্ ভাষা হইতে আদর্শ লইয়া বঙ্গভাষায় চতুর্দ্দশ পদী কবিতার সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার নূতন ছন্দঃ তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একপ্রকার নূতন রচনাপ্রণালী প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার একটী অভাব মোচন করিয়াছেন। সর ওয়াল্টার স্কট প্রভৃতি

লেখকগণ যেমন ইংরাজীতে নবেল লিখিয়াছেন, বঙ্কিমবাবুর দ্বারা তদ্রূপ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, ও মৃণালিনী নাম্নী তিনখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই সকল পুস্তকের বিশেষ গুণ এই যে, যত পাঠ করা যায়, ততই পঠনেচ্ছা বলবতী হইতে থাকে। ইঁহার প্রণীত একখানি পদ্য গ্রন্থও আছে।

অশেষগুণালঙ্কৃত পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লেখনী কেবল সংবাদপত্র লিখিয়াই নিরস্ত নহে। অবকাশমতে অস্মদ্দেশীয় বালকবৃন্দের নিমিত্ত গ্রীসের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস, নীতিসার প্রভৃতি কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তকও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু "সোমপ্রকাশ" তাঁহার যশঃকীর্ত্তির স্তম্ভ-মূল দৃঢ়ীভূত করিয়াছে।

বিবিধ গুণরাশি বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বঙ্গভাষার একটী মহৎ অভাব পূরণ করিয়াছেন। ইঁহার দ্বারাই প্রথম সুপ্রণালীবদ্ধ বৈজ্ঞানিক পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রচারিত হইয়াছে। ইঁহার প্রণীত প্রাকৃত বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ত্ব, ইংলণ্ডের ইতিহাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্গবিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য পুস্তক। এডুকেশন গেজেটের বর্ত্তমান সমৃদ্ধাবস্থা ভূদেববাবুর দ্বারা সাধিত হইতেছে।

বাবু হরিশচন্দ্র মিত্র, হরিমোহন গুপ্ত, দ্বারকানাথ রায়, বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বঙ্গভাষার গণনীয়

কবি। হরিশ বাবু বহুকাল হইতে সাহিত্য-সংসারে গুঞ্জন করিতেছেন। ইঁহার দ্বারা অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। গদ্য পদ্য উভয়-বিধ রচনায় ইঁহার বিশেষ ক্ষমতা দেখা যায়। ইনি বিধবা বঙ্গাঙ্গনা, কীচকবধ কাব্য, রামায়ণ—আদিকাণ্ড, বীরবাক্যাবলী, সীতা-নির্ব্বাসন কাব্য, কবিরহস্য, জানকী নাটক, জয়দ্রথ নাটক, কবিকলাপ ইত্যাদি পুস্তক সমূহ রচনা করিয়াছেন। পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে ইনি বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে একজন প্রসিদ্ধ লোক। হিন্দু-হিতৈষিণী, ঢাকাদর্পণ, হিন্দুরঞ্জিকা প্রভৃতি সংবাদপত্র ইঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইত। এক্ষণে “মিত্র-প্রকাশ” নামক সাহিত্য-সমালোচক-পত্র সম্পাদন করিতেছেন। মান্যবর হরিমোহন গুপ্ত মহাশয় রামায়ণ, সন্ন্যাসীর উপাখ্যানাদি পুস্তক লিখিয়া কবি-যশঃ লাভ করিয়াছেন। বাবু দ্বারকানাথ রায় প্রকৃতসুখ, কবিতাপাঠ, প্রকৃতি-প্রেম, রাসামৃত, সুশীল মন্ত্রী, মোহমুদ্গার ও স্ত্রীশিক্ষা বিধানের প্রণেতা। তিনি “সুলভ-পত্রিকা” নাম্নী এক খানি নীতিগর্ভ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দ্বারকানাথ রায়ের গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনাই সরল। বিহারিলাল বাবু “অবোধবন্ধু” পত্রের সম্পাদক। সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ সন্দর্শন, প্রেমপ্রবাহিনী, এবং বন্ধু-বিয়োগ ইঁহার উৎকৃষ্ট রচনাশক্তির পরিচয় দিতেছে।

কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় বিংশতি বৎসর কাল শিক্ষা বিভাগে অতিবাহিত করিয়া, বঙ্গভাষায় "শিক্ষাপ্রণালী" প্রস্তুত করিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত "গোলকের উপযোগিতা" দ্বারা আর একটী অভাব পূরণ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বালকদিগের পাঠোপযোগী নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছেন। যথা,— হিতশিক্ষা চারিভাগ। বর্ণশিক্ষা দুইভাগ। মানসাঙ্ক ছয়ভাগ। এবং মাদক সেবনের অবৈধতা।

সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রথম "পাটীগণিত" ও "বীজগণিত" সঙ্কলন পূর্ব্বক বাঙ্গালায় অঙ্কশিক্ষার্থিগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

সজ্জনপ্রধান বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশের দ্বারা বঙ্গভাষার বিস্তর উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর চারিখণ্ড "তত্ত্ববিদ্যা" রচনা করিয়া,বঙ্গসমাজে বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ভারতবর্ষের ইতিহাস" অতিশয় প্রসংশনীয়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা বঙ্গ ভাষায় প্রথম উৎকৃষ্ট ভূগোল রচিত হয়।

সংস্কৃত কালেজের কৃতবিদ্য ছাত্র বাবু লাল মোহন ভট্টাচার্য্যের দ্বারা বঙ্গ ভাষার অতি উৎকৃষ্ট "অলঙ্কার কাব্য নির্ণয়" প্রকাশিত হইয়াছে।

অনুবাদক সমাজের সাহায্যে বাবু মধুসূদন মুখোপাধ্যায় দ্বারা সুশীলার উপাখ্যান তিন খণ্ড, নুরজিহানের জীবনচরিত, ও অহল্যা হড্ডিকার জীবনচরিত ইত্যাদি অনেকগুলি পুস্তক রচিত হইয়াছে। এই সকল পুস্তকের রচনা অতিশয় সরল।

মৃত বাবু নীলমণি বসাক ও রাধামোহন সেন এবং পণ্ডিতবর মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশকর্ত্তৃক অনেকগুলি পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। প্রথমোক্ত মহোদয়ের নবনারী, ভারতবর্ষের ইতিহাস, পারস্যউপন্যাস, অতীব প্রশংসনীয়। পণ্ডিতবর মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অনেকগুলি ভিন্ন ভাষাস্থ পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। "সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে" প্রকাশিত পুরাণাদির অনুবাদ, এবং আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে।

পণ্ডিতবর রামনারায়ণ তর্করত্ন, বাবু দীনবন্ধু মিত্র, ও উমেশচন্দ্র মিত্র নাটক রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

অস্মদ্দেশীয় মহিলাকুলের গরিমাস্বরূপা, পাবনা-নিবাসিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবী এবং কলিকাতাস্থ শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দেবী বঙ্গভাষায় লেখনী ধারণ করত, বিশেষ আদরণীয়া হইয়াছেন।

ধর্ম্মপ্রচারক বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহোদয় দ্বারাও বঙ্গভাষার বিস্তর উপকার হইয়াছে। ইঁহার সদুপ-

দেশপূর্ণ বক্তৃতা সমূহ পাঠ করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হন। সম্প্রতি কয়েক মাস হইল, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া "সুলভসমাচার" নামক একখানি এক পয়সা মূল্যের পত্র প্রচার করিয়াছেন। এক্ষণে বাঙ্গালাভাষার শুভকাল উপস্থিত। পূর্ব্বোক্ত সুলভের আদর্শ গ্রহণ করিয়া অনেকগুলি পত্র প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "সাহিত্যমুকুর" বর্ণনার যোগ্য।

এতদ্ব্যতিরিক্ত "আমার গুপ্ত কথা" নামক একখানি রহস্যমূল ও উপদেশপূর্ণ নবেল সংখ্যানুসারে প্রকাশিত হইতেছে। সম্প্রতি দ্বাবিংশতি ফর্ম্মায় প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত হইয়াছে। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলাম, শোভাবাজারের রাজবংশীয় বিদ্যানুরাগী শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের যত্নে ও উপদেশে প্রভাকরের সহকারী সম্পাদক ভুবন বাবু ইহার রচনা করিতেছেন। ইহা পাঠ করিয়া অনেকেই কৌতুক ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার বঙ্গদেশের দুর্নীতি সংশোধনার্থ যত্নশীল হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি, দেশহিতৈষী মহোদয়গণ রচয়িতাকে উৎসাহিত করিয়া প্রকৃতগুণের আদর করিবেন।

পণ্ডিতবর আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, মথুরানাথ

তর্করত্ন, লোহারাম শিরোরত্ন, মধুসূদন বাচস্পতি, রামগতি ন্যায়রত্ন, বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যালয় সমূহের ডিপুটি ইনস্পেক্টর বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায়, হাইকোর্টের ইন্টারপ্রিটর বাবু শ্যামাচরণ সরকার, বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, গ্রামবার্ত্তা সম্পাদক বাবু হরিনাথ মজুমদার এবং পাদরি লং ও রবিনসন সাহেব প্রভৃতি মহোদয়গণ বহু দিন অবধি বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে ব্রতী হইয়াছেন।

বহরমপুরস্থ বিদ্যানুরাগী জমিদার বাবু রামদাস সেন, দীনপালিনী বিদ্যানুরাগিণী রাণী স্বর্ণময়ী, মুক্তাগাছাস্থ জমিদার বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্যচৌধুরী এবং রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি মহোদয়গণ বিদ্যোৎসাহিতাগুণে চিরস্মরণীয় যশোলাভ করিয়াছেন। যে কোন নূতন পুস্তক বা পত্রিকা প্রচারিত হয়, ইঁহারা অতি আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন কোন পত্রিকার সম্পাদক বা গ্রন্থ রচয়িতা উঁহাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে প্রশস্ত হৃদয়ে অর্থ দান করিতে কুণ্ঠিত হন না। রামদাস বাবুর রচনাশক্তিও সাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী। ইঁহার রচিত তিনখানি কাব্য পুস্তক অতি সুললিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল সমালোচনা করিয়া, বঙ্গভাষার তিনটি অবস্থা নির্ণীত হইল। প্রথম, নানা ভাষার বিমিশ্র

অবস্থা। দ্বিতীয়, বাঙ্গালা বা প্রাকৃত। এবং তৃতীয় সংস্কৃত বা বিশুদ্ধ।

প্রায় নিত্য নিত্যই এখন নূতন নূতন অনেক পুস্তক আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তাহার অধিকাংশই অসার। কলিকাতা বটতলার অনেক পুস্তক বঙ্গভাষার অপমান স্বরূপ।